শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্‌তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
খতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- ইসলাহী খুতুবাত (১-১০)
- আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার
- আধুনিক যুগে ইসলাম
- সাম্রাজ্যবাদির আগ্রাসন প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- দারুল উলূম দেওবন্দ-উলামায়ে দেওবন্দ কর্ম ও অবদান
- ইযাহুল মুসলিম [মুসলিম জিলদে সানীর অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- ইযাহুল মুসলিম [মুসলিম জিলদে আওয়ালের অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- দরসে বাইযাবী [শরহে তাফসীরে বাইযাবী বাংলা]
- হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- স্বপ্নের তারকা [সিরিজ ১ ও ২]
- আর্তনাদ [সিরিজ ১, ২]
- মীম
- সুলতান গাজী সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবী
- সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম

সূচিপত্র

পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি নিদর্শন

মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য

লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখুন

বিষয় পৃষ্ঠা

সংক্ষেপে ইসলাম

যাকাত কিভাবে আদায় করবেন?

কুমন্ত্রণা কি আপনাকে চিন্তিত করে?

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

বিষয় পৃষ্ঠা

অন্যায় ও অপরাধকে রুখে দিন

বিষয় পৃষ্ঠা

জান্নাতের দৃশ্যাবলী

আখেরাতের ভাবনা

অপরকে খুশি করুন

অপরের মর্জি ও রুচির মূল্যায়ন করুন

পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি নিদর্শন

"অনেক সময় গোস্বার ভুল ব্যবহার একজন দ্বীনদার ব্যক্তি থেকেও হয়। তিনি মনে করেন, দুনিয়ার সবাই খারাপ। সবাই জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে আর আল্লাহ তাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন জাহান্নামের পথের এসব যাত্রীকে সংশোধন করার। এ জাতীয় মনোভাব মূলত শয়তানের কুমন্ত্রণা। শয়তানের এ সবক পেয়ে তিনি তখন পদে-পদে মানুষের দোষ ধরেন, মানুষের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং যখন-তখন গোস্বা দেখান। আর এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে একের পর এক সামাজিক অনাচার।

মূলত হক কথা বলতে হবে হক নিয়তে ও হক তরীকায়। দরদ ও নম্রতার মিশেল আপনার হক কথার মাঝে থাকতে হবে এবং কাউকে কখনও 'নষ্ট হয়ে গেছে' মনে করা যাবে না। তাহলে হক কথা বলার কারণে ফেতনা সৃষ্টি হবে না। যদি শোনেন যে, হক কথা বলার কারণে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে,- হয়ত কথাটি হক ছিলো না বা নিয়ত হক ছিলো না কিংবা তরীকা হক ছিলো না।"

পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি নিদর্শন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ (ترمذى ، ابواب صفة القيامة ، باب نمبر ٦١)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দেয়ার সময় আল্লাহর জন্য দেয়; যখন কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর জন্য বিরত থাকে; কাউকে ভালোবাসে তো আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখে তো আল্লাহর জন্য রাখে; তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো।

আল্লাহর রাসূল (সা.) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন।

প্রথম নিদর্শন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষ্যমতে পরিপূর্ণ ঈমানের প্রথম নিদর্শন হলো, আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয়া। এর মর্মার্থ হলো, মানুষ সব সময় যেমনিভাবে নিজের জন্য খরচ করে, তেমনিভাবে দান-সদকা-হাদিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের জন্যও করে। খরচকালীন যদি এ নিয়ত থাকে যে, 'আমি আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্য খরচ করছি, তাহলে সেও হাদীসের ভাষ্যভুক্ত হবে। দান-সদকার সময় খোঁটা কিংবা লৌকিকতা উদ্দেশ্য না থাকলে; বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকলে এতে সে সাওয়াব পাবে। সুতরাং নিয়ত শুদ্ধ করা উচিত।

বেচা-কেনার সময়ও এ নিয়ত করবে

দান-সদকা ছাড়াও সব খরচেরই ক্ষেত্রে এ নিয়ত করা চাই। যেমন বেচা-কেনার সময়ও এ নিয়ত করা যেতে পারে। বেচা-কেনা বাহ্যত একটি পার্থিব বিষয়। কিন্তু মনে করুন, খরিদকৃত বস্তুটি যদি গোশত, মাছ বা তরকারি হয়, আর তখন যদি এ নিয়ত করা হয় যে, আল্লাহ আমার উপর জিম্মাদারি দিয়েছেন, যেন আমি পরিবারের খোর-পোশের ব্যবস্থা করি; এ সুবাদেই আমি এগুলো কিনলাম। দ্বিতীয়ত, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে আল্লাহ হালাল উপায় গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, তাই আমি হারাম উপায় বর্জন করে হালাল উপায় গ্রহণ করলাম। তাহলে এ দুটি নিয়তের কারণেই এ পার্থিব বিষয়টিও আল্লাহর জন্যই হলো। এটাও পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নাও

ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, দ্বীন ও দুনিয়া মূলত অভিন্ন বিষয়। পার্থক্যটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দাও; দেখবে, তোমার দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। এর পদ্ধতি হলো, দুনিয়াতে তুমি যেসব কাজ করছো, এগুলো বহাল থাকুক, কিন্তু একটু দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টিয়ে নাও। শোওয়া, ওঠা, বসা, পানাহার– এ সবই তোমার নিত্যদিনের কাজ। এগুলো করার সময় ভাবো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

ان لنفسك عليك حقا (صحيح البخارى ١/٢٦٤)

'তোমার উপর তোমার নিজেরও হক আছে।'

সুতরাং এ হক পূরণের জন্যই এগুলো করছি। খানা খাচ্ছি, শরীরের হক পূরণের জন্য খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, শরীরের হক পূরণের জন্য ঘুমোচ্ছি। অনুরূপভাবে কল্পনা করো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে খানা এলে তিনি এটিকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করতেন এবং তার শুকরিয়া আদায় করতেন। আমি এ সুন্নাতটির অনুসরণ করে যাচ্ছি। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টাতে পারলে দেখবে, সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার প্রতিটি কাজ দুনিয়াবী খোলস ছাড়িয়ে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

প্রতিটি নেক কাজই সদকা

মানুষ মনে করে, গরীব-দুঃখীকে কিছু দেয়ার নামই সদকা। এ ছাড়া আর কোনো সদকা নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নেক নিয়ত দ্বারা সমৃদ্ধ প্রতিটি নেক কাজই সদকা। এমনকি মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে যে লোকমাটি তার মুখে তুলে দেয়, নেক নিয়ত থাকলে এটাও সদকা হিসাবেই গণ্য হবে। শুধু নিয়ত করতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর স্ত্রীর কিছু হক দেয়া হয়েছে, সে সুবাদেই আমি কাজটি করলাম। ব্যস! শুধু এ নিয়তের কারণেই এ কাজেও সাওয়াব পাবে। এ সবই 'আল্লাহর জন্য দান করার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় নিদর্শন

পরিপূর্ণ ঈমানের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, যদি কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাও আল্লাহরই জন্য। যেমন ব্যয় না করে টাকা বাঁচানো, এটাও 'কাউকে কিছু না দেয়ার' অন্তর্ভুক্ত। এটাও করতে হবে আল্লাহরই জন্য, যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অপচয় থেকে বারণ করেছেন। সুতরাং এ অপচয় থেকে বাঁচার জন্যই টাকা বাঁচানো। অথবা মনে করুন, কেউ আপনাকে শরীয়ত অসমর্থিত কোনো কাজে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করলো। আপনি সাড়া দিলেন না, বরং বিরত থাকলেন, তাহলে এই না দেওয়াও আল্লাহর জন্যই হলো।

প্রথাগত উপহার দেয়া

বর্তমান সমাজে উপহার দেয়া-নেয়ার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বিশেষত বিয়ে-শাদি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রথাটি আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে হয়, যেন এসব ক্ষেত্রে উপহার না দিলে নাক-কান কাটা যাবে। এজন্য প্রয়োজনে ঋণ করে সুদ-ঘুষ দ্বারা উপার্জন করে হলেও যেন উপহার দিতেই হবে। এক ব্যক্তি সামাজিক এ আবেদনকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপেক্ষা করল, তাহলে তার এ উপহার না দেয়াটাও আল্লাহর জন্যই হলো।

তৃতীয় নিদর্শন

পরিপূর্ণ ঈমানের তৃতীয় নিদর্শন হলো, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা একটি খাঁটি ও উপকারী ভালোবাসা। এ ভালোবাসার ক্ষেত্রে সাধারণত পার্থিব কোনো স্বার্থ থাকে না।

বরং উদ্দেশ্য থাকে শুধু দ্বীনি ফায়দা। আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে– সাধারণত এ জাতীয় পবিত্র নিয়তই অন্তরে থাকে। এজন্য আল্লাহওয়ালাদেরকে মহব্বত করার মাঝে অনেক উপকারিতা বিদ্যমান। এটি পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শনও।

আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসা যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে হয়

শয়তান ও নফসের চতুরতার কাছে অনেক সময় মানুষ ধরা পড়ে যায়। তারা সহীহ পদ্ধতির মাঝে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসা একটি নিখাঁদ ও পবিত্র ভালোবাসা। কিন্তু এর ভেতরেও শয়তান ও নফসের ধোঁকা অনেক সময় চুপিসারে ঢুকে পড়ে। শয়তান তখন এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, অমুক বুযুর্গের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভালো হলে তোমার মূল্য বেড়ে যাবে। তখন মানুষ বলবে যে, এ লোকটি অমুক বুযুর্গের খাছ লোক। এভাবে শয়তান একটি নির্ভেজাল ভালোবাসাকে পরিণত করে স্বার্থলিপ্সু ভালোবাসায়। শয়তানের চতুরতা বোঝা বড় কঠিন। অনেক সময় মানুষ তার ধোঁকায় পড়ে ভাবে যে, অমুক বুযুর্গের কাছে কত ধনী ও প্রতাপশালী লোক আসে, সুতরাং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারলে আমার দুনিয়াবি ফায়দাও হবে। তাঁর মাধ্যমে ওইসব বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হবে। ফলে এ পবিত্র সম্পর্ক ও ভালোবাসা রূপান্তরিত হয় স্বার্থপূর্ণ ভালোবাসায়। এজন্য ওস্তাদ, পীর, বুযুর্গ ও মুরুব্বিজনকে ভালোবাসতে হলে এ সব বদনিয়ত বর্জন করতে হবে। এভাবেই ঈমান পরিপূর্ণ হবে। অন্যথায় এ খাঁটি ভালোবাসাও গুনাহের 'কারণ' হয়ে যাবে।

পার্থিব ভালোবাসাসমূহও আল্লাহর জন্য করে দাও

কিন্তু এ ছাড়াও পার্থিব জগতে আরো কিছু ভালোবাসা রয়েছে। যেমন- মাতা-পিতা, ভাই-বোন, বিবি-বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যে ভালোবাসা, তা পার্থিব ভালোবাসা। একটু দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে এসব ভালোবাসা হতে পারে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। যেমন মাতা-পিতাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভালোবাসবে যে, এটা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর হুকুম। এমনকি তিনি বলেছেন, মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে এক হজ্ব ও উমরার সাওয়াব পাবে; তাই আমি আমার মাতা-পিতাকে ভালোবাসছি। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে তখন স্বভাবজাত এ ভালোবাসাও আল্লাহর জন্য ভালোবাসার শামিল হয়ে যাবে।

আল্লাহর জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি একটি জৈবিক প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করা হলে তা আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। যেমন– এ নিয়ত করা যে, স্ত্রীকে ভালোবাসার নির্দেশ তো আল্লাহর রাসূল (সা.) দিয়েছেন। তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীদেরকে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁরই সুন্নাতের অনুসরণে আমিও আমার স্ত্রীকে ভালোবাসছি। এভাবে নিয়তকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে এ ভালোবাসাও হবে আল্লাহর জন্যই। একজন মানুষ নিজের স্ত্রীকে জৈবিক প্রয়োজনেই খুব ভালোবাসে। অপরজনও একই কারণে তাকে ভালোবাসে। তবে সে নিয়ত করেছে সুন্নাতের অনুসরণের। তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুইজনের ভালোবাসা এক রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মাঝে রয়েছে আসমান-জমিন তফাৎ। প্রথমজনের ভালোবাসা নিরেট পার্থিব ভালোবাসা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জনের ভালোবাসা সুন্নাতী ভালোবাসা। প্রথমটি দুনিয়ার জন্য হল আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর জন্য। এ পার্থক্যটা হয়েছে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কারণেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদেরকে এমন ভালোবাসা দিয়েছেন, যা দেখলে আমাদেরকে অবাক হতে হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, তিনি নিজ স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে এগার নারীর গল্প শুনিয়েছেন। ওরা এগারজন একসঙ্গে বসেছে। প্রত্যেকেই নিজের স্বামীর গল্প শোনানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে। তারা একজন একজন করে প্রত্যেকেই নিজের স্বামীর গল্প বলেছে। দীর্ঘ গল্প। আর এগার নারীর এ গল্পটি রাসূলুল্লাহ (সা.) শুনিয়েছেন হযরত আয়েশা (রা.)-কে। দেখুন, যে মহান সত্তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্যও শিথিল হয়নি, সেই তিনি নিজ স্ত্রীকে এগার নারীর দীর্ঘ গল্প শোনাচ্ছেন।

আরেকবারের ঘটনা। খোলা প্রান্তর। রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)- কে সাথে নিয়ে সফরে বের হয়েছেন। দাওয়াতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এরই মধ্যে তিনি আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আয়েশা! এ খোলা প্রান্তরে আমার সঙ্গে দৌড় দেবে? আয়েশা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তারপর উভয়ে সেখানে দৌড়প্রতিযোগিতা দিলেন। যেহেতু স্থানটা ছিল জনমানবশূন্য, তাই পর্দা লঙ্ঘনের কোনো সম্ভাবনা সেখানে ছিল না।

আমাদের কাজগুলো হয় প্রবৃত্তির তাড়নায়

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাজটি দৃশ্যত আল্লাহ কিংবা আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আমরা যা করি, তাও দৃশ্যত এরকমই মনে হয়। কিন্তু আমাদের কাজ আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাজের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আমরা শুধু প্রবৃত্তির কারণে স্ত্রীকে খুশি করার মত কাজ করি। আর আল্লাহর রাসূল (সা.) এ জাতীয় কাজ করতেন, যা তাঁর মাকামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণও বটে, তবুও তিনি করতেন আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যই। কেননা, স্ত্রীকে খুশি করার নির্দেশ তো আল্লাহরই।

'আরিফ' কাকে বলে?

সূফিগণ বলেছেন, আরিফ অর্থাৎ মারেফাত, শরীয়ত ও তরীকতের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তিনিই, যার মাঝে একত্র হয়েছে বিপরীতমুখী বহু গুণ। যেমন একদিকে তিনি আল্লাহর সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় রাখেন, যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকেন, অস্থিমজ্জায় শুধু আল্লাহরই ধ্যান রাখেন, অপরদিকে তিনি মানুষের সঙ্গে, ঘরের লোকদের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে স্বাভাবিক ওঠা-বসা করেন, তাদের সঙ্গে হাসেন, গল্প করেন, পানাহার করেন। এ দ্বিমুখী স্বভাব যার মাঝে আছে, তিনিই প্রকৃত 'আরিফ'।

সূচনাকারী ও সম্পন্নকারীর মাঝে পার্থক্য

সূফিগণ আরো বলেছেন, যিনি তরীকতের পথে সবেমাত্র চলা শুরু করেছেন, তিনি সূচনাকারী। আর যিনি এ পথ জয় করে নিয়েছেন, তিনি সম্পাদনকারী। উভয়ের অবস্থা বাহ্যত এক মনে হয়। পক্ষান্তরে যিনি এ পথের মাঝামাঝিতে পৌঁছেছেন, তাঁর অবস্থান হয় ভিন্ন।

যেমন– এক ব্যক্তি দ্বীনের পথে মাত্র চলা শুরু করেছেন। তিনি দুনিয়ার সব কাজ স্বাভাবিকভাবেই করেন। পানাহার করেন, পরিবার-পরিজনের সঙ্গেও হাসি-গল্প করেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)– যিনি তরীকতের পথে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন, তিনিও দুনিয়ার সব কাজ স্বাভাবিকভাবেই করতেন। পানাহার করতেন, বেচা- কেনা করতেন, বাজারে যেতেন এবং হাসি-মশকরাও করতেন। দৃশ্যত উভয়ের কাজ একই রকম মনে হয়। পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তি– যিনি তরীকতের পথে কিছুটা উন্নতি করেছেন, তবে এখনও এ পথ জয় করতে পারেননি। বরং মাঝামাঝি কোনো স্তরে অবস্থান করছেন। তাঁর অবস্থা হয় অন্যরকম। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করেন না, নিয়মিত পানাহার করেন

না, বাজারেও যান না; বরং সর্বদা ডুবে থাকেন আল্লাহর ধ্যানে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ধ্যান শুধু আল্লাহকে নিয়েই। এ ছাড়া অন্য কাজ করার মত ফুরসত তাঁর হয়ে ওঠে না।

একটি দৃষ্টান্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তরীকতের পথের উক্ত তিন ধরনের যাত্রীর কর্মকাণ্ড একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এভাবে– যেমন একটি সমুদ্র। এক ব্যক্তি এ সমুদ্র পাড়ি দিতে চাচ্ছে, তাই সে দাঁড়িয়ে আছে তীরে। অপর ব্যক্তি সমুদ্রটি পাড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য তীরে। তৃতীয় ব্যক্তি সমুদ্রের মাঝখানে আছে, হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অপর পাড়ে পৌঁছানোর জন্য। এখন দেখুন, প্রথম ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও অবস্থান অভিন্ন। সমুদ্রের তীরেই উভয়ের অবস্থান। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রথম ব্যক্তি তো এখনও সমুদ্রে প্রবেশই করেনি, তাই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মুখোমুখি সে এখনও হয়নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি তো এসব উত্তাল তরঙ্গ জয় করে সমুদ্রের অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে অনেক আগেই। আর তৃতীয় ব্যক্তি? সে লড়াই করে যাচ্ছে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে। হাত-পা ছুঁড়ছে, পানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। বাহ্যত মনে হয়, এ ব্যক্তিই আসল বাহাদুর। কিন্তু বাস্তবেই কি সে আসল বাহাদুর? বরং মূলত বাহাদুর তো সেই– যে সমুদ্র জয় করে পৌঁছে গিয়েছে অপর প্রান্তে। যদিও তাকে মনে হয় ঐ ব্যক্তির মত, যে অপর প্রান্তে পৌঁছার উদ্দেশ্যে সবেমাত্র তীরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন

অনুরূপভাবে পার্থিব ভালোবাসাগুলোকে আল্লাহর জন্য করতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘ অনুশীলন। বুযুর্গানে দ্বীন ও সূফিগণ মানুষকে দিয়ে এ অনুশীলন করাতেন। তাঁরা মানুষের পার্থিব ভালোবাসাসমূহের মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। অর্থাৎ এসব ভালোবাসার বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন নয়, বরং এগুলোর গতিকে পরিবর্তন করে দিতেন আল্লাহর দিকে। আর এটা হতো দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে। হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, ভালোবাসার গতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমি অনুশীলন করেছি বছরের পর বছর। এরপর সফলতার ছোঁয়া পেয়েছি। অনুশীলন করেছি এভাবে, যেমন– ঘরে প্রবেশ করেছি, খাওয়ার সময় হয়েছে। খাবার সামনে চলেও এসেছে। পেটেও প্রচণ্ড ক্ষুধা। মন চাচ্ছিল এক নিমিষেই সব সাবাড় করে ফেলি। কিন্তু না! তা করলাম

না। আহার শুরু না করে ক্ষণিকের জন্য ভাবলাম, নফ্সের খাহেশ পূরণের জন্য খাবো না। বরং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত আদায়ের জন্য খাবো। খাবার সামনে এলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া তো আদায় করতেন। ভাবতেন, খাদ্য দ্বারা শরীরের হক পূরণ হয়। খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন তিনি। তারপর খেতেন। সুতরাং আমিও এ নিয়তে খাচ্ছি। তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করেই খাচ্ছি।

আল্লাহর জন্য শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

অনুরূপভাবে ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, বাচ্চা খেলাধুলা করছে। তখন হয়ত মনে চেয়েছে যে, বাচ্চাটিকে কোলে নেবো, আদর করবো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা না করে মুহূর্তের জন্য থেমে গেলাম। ভাবলাম, মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাচ্চাটিকে কোলে নেবো না। পরক্ষণেই ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) তো শিশুদেরকে ভালোবাসতেন। একবারের ঘটনা। তিনি মদীনার মসজিদে জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) পড়িমড়ি করে মসজিদে ঢুকল। তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁদেরকে তুলে নিলেন কোলে। আরেকবারের ঘটনা, হযরত উসামা (রা.) তখন ছিলেন শিশু। আল্লাহর রাসূল (সা.) নফল নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে উসামা কিভাবে যেন তাঁর কাঁধে চড়ে বসল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। বরং রুকুতে যাওয়ার সময় আস্তে করে তাকে রেখে দিলেন পেছনের দিকে। তারপর যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন উসামা আবার তাঁর পিঠে চড়ে বসল। মোটকথা, আল্লাহর রাসূল (সা.) শিশুদেরকে স্নেহ করতেন এভাবেই। সুতরাং আমিও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করবো। এ চিন্তা করেই বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে নিলাম।

প্রথম দিকে ভাবনার এ পরিবর্তনের জন্য কৃত্রিমতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনুশীলনের ফলে একটা সময় আসে, যখন কৃত্রিমতা আর থাকে না। তখন স্বভাবই হয়ে যায় এমন। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের, নিয়তকে সঠিক পথে পরিচালনার উক্ত টিপ্স সত্যিই চমৎকার, সহজও। তবে এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলনের, যার ফলে একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার প্রতিটি ভালোবাসা ও স্নেহ আল্লাহর জন্যই হবে।

আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

আমার ভালোবাসাটা আল্লাহর জন্যই হচ্ছে– এটা বুঝবো কীভাবে? এর নিদর্শন কী? এর নিদর্শন হলো, যদি কখনও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার যে দাবী

রয়েছে, তারই কারণে আমার দুনিয়াবী ভালোবাসাটা ছাড়ার প্রয়োজন হয়, যদি তখন আমার কষ্ট না হয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে সক্ষম হই, তাহলে এটাই 'আল্লাহর জন্য ভালোবাস'র নিদর্শন।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার তিনি উপস্থিত লোকজনকে নিজের ব্যক্তিগত একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আজ পরীক্ষার এক আশ্চর্য সুযোগ আমাকে দান করলেন। আজ ঘরে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হলো। তখন একটা বিষয়ে সে আমাকে একটু বকাঝকা করলো। আমি তখন একটু রেগে গিয়ে বললাম, বিবি! তোমার এ জাতীয় আচরণ আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। যদি বলো যে, আমি আজ থেকে খানকায় থাকার ব্যবস্থা করি, একটি চৌকি ফেলে সেখানে আজীবন কাটিয়ে দিই। তবুও তুমি এ জাতীয় ব্যবহার আমার সঙ্গে করো না।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, বিবিকে তো এমন কঠিন করে কথা বলে দিলাম। কিন্তু এরপর আমি ভাবলাম, আসলেই কি আমি এটা করতে পারবো? খানকায় আজীবন কাটিয়ে দেবার দাবী মিথ্যা হয়ে যায়নি তো? যদি বিবি বলে দিত, যান, আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন, তাহলে সত্যিই কি বিবিকে ছাড়া আমি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম? আলহামদুলিল্লাহ! এভাবে নিজেকে নিয়ে আমি ভেবে দেখলাম এবং অনুভব করলাম যে, আমি পারবো। কেননা, এসব ভালোবাসা তো আল্লাহর জন্যই। আর আল্লাহর মহব্বতের খাতিরেই যে কাউকে আমি ছাড়তে পারবো, এতে আমার কষ্ট হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এত বড় দাবী তিনিই করতে পারেন, যিনি দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে أَحَبَّ لِلّٰهِ তথা আল্লাহর ভালোবাসার অধীনে করে নিয়েছেন। দীর্ঘ মেহনত ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এ স্তরে পৌঁছা সম্ভব।

চতুর্থ নিদর্শন

ঈমানের চতুর্থ নিদর্শন হল, وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ অর্থাৎ বিদ্বেষ ও গোস্বা আল্লাহর জন্য হওয়া। তথা কারো প্রতি নিজের ব্যক্তিগত কারণে বিদ্বেষ নয়, গোস্বা নয়, কিংবা ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার মনোভাব নয় এবং গোস্বা নয়। বরং বিদ্বেষ ও গোস্বা হতে হবে তার শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজের কারণে কিংবা তার ঐ কর্মকাণ্ডের কারণে, যা আল্লাহকে নারাজ করে।

ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যাবে না

এ কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন সর্বদা মনে রাখার মত একটি কথা বলেছেন যে, কাফেরকে নয়, বরং কুফরকে ঘৃণা কর। পাপীকে নয়, বরং পাপকে ঘৃণা কর। গোনাহগারকে নয়, বরং গোনাহকে ঘৃণা কর। ব্যক্তি কখনও ঘৃণার পাত্র হতে পারে না। বরং ঘৃণার পাত্র হলো ব্যক্তির অশোভনীয় কাজ। ব্যক্তি তো দয়ার পাত্র। কারণ, সে কুফর নামক মহামারিতে এবং ফিস্‌ক ও গোনাহ নামক মহাব্যধিতে আক্রান্ত। আর ঘৃণা রোগীর প্রতি নয়, বরং রোগের প্রতি হয়। সুতরাং কুফ্‌র, ফিস্‌ক ও গোনাহর প্রতিই ঘৃণা হওয়া উচিত। কাফের, ফাসেক ও গোনাহগারের প্রতি বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। ব্যক্তি তার অপরাধ থেকে ফিরে এলে সে তো 'প্রিয় মানুষ' হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কাজেই ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল দেখুন, যে নারী তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচার কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল, অর্থাৎ হযরত হিন্দ (রা.) এবং যে লোকটি তাঁর এ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল অর্থাৎ হযরত ওয়াহশী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর এমন জঘন্য অপরাধী হয়ে গেল মুসলিম বোন এবং মুসলিম ভাই। কৃত অপরাধ থেকে তাঁরা যখন ফিরে এল এবং ইসলামকে আপন করে নিল, তখন থেকে তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল রাযিয়াল্লাহু আনহু। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মূলত ব্যক্তি ঘৃণ্য ছিল না, বরং ঘৃণ্য ছিল তাদের কর্মকাণ্ড ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। ঘৃণ্য বস্তু দূর হয়ে যাওয়ায় ব্যক্তি আপন বিভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং 'সাহাবী'র মর্যাদায় পৌঁছে গেল।

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) একজন উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সময়ে হাকীম জিয়াউদ্দীন নামক একজন উঁচুমানের আলেম, মুফতী ও ফকীহ ছিলেন। খাজা নিজামুদ্দীন সূফী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর হাকীম জিয়াউদ্দীনের সুখ্যাতি ছিলো আলেম, মুফতী ও ফকীহ হিসাবে। খাজা সাহেব 'সিমা'কে জায়েয মনে করতেন। 'সিমা' হলো বাদ্য ছাড়া সুরেলা ভঙ্গিতে হাম্‌দ, নাত, তারানা ইত্যাদি পড়া এবং অন্যান্যরা তা ভক্তিসহ শোনা। অনেক সূফীর মতে সিমা জায়েয। আবার অনেক ফকীহর মতে এটা নাজায়েয বরং বিদ'আত। হাকীম সাহেবও বিদ'আত মনে করতেন। আর খাজা সাহেব জায়েয মনে করতেন।

হাকীম সাহেব যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন খাজা সাহেব তাঁকে দেখতে গেলেন। ভেতরে সংবাদ পাঠালেন যে, খাজা সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি এসেছেন আপনার খোঁজ-খবর নিতে। হাকীম সাহেব বার্তাবাহককে বললেন, তাঁকে আমার কাছে আসতে দিবে না। কারণ, আমি কোনো বিদ'আতির মুখ দেখতে চাই না। খাজা সাহেব পুনরায় সংবাদ পাঠালেন যে, হাকীম সাহেবকে গিয়ে বলুন যে, বিদ'আতি এসেছে বিদ'আত থেকে তাওবা করার জন্য। বার্তাবাহক গিয়ে তাই বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাকীম সাহেব তাকে নিজের পাগড়ি দিয়ে বললেন, খাজা সাহেবের সৌজন্যে পাগড়িটা বিছিয়ে দিবে এবং আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, তিনি জুতা পায়ে দিয়ে এ পাগড়ির উপর দিয়ে আসেন; খালি পায়ে যেন না আসেন। আর খাজা সাহেবও পাগড়িটি পেয়ে মাথায় তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার জন্য এটি ফযীলতের পাগড়ি। তারপর এভাবেই তিনি ভেতরে গেলেন। হাকীম সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন, বসলেন, কিছু কথাবার্তাও বললেন। অবশেষে খাজা সাহেবের উপস্থিতিতে হাকীম সাহেব ইন্তেকাল করলেন। খাজা সাহেব তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আলহামদুলিল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা হাকীম জিয়াউদ্দীনকে কবুল করেছেন এবং উচ্চমর্যাদা দানসহ নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন।

গোস্বা হওয়া চাই আল্লাহর জন্য

মোটকথা, গোস্বা ও বিদ্বেষ ব্যক্তির প্রতি হলে এর ফল মোটেও ভালো হয় না। বরং এর দ্বারা যাবতীয় ফেতনার উদ্ভব ঘটে। পক্ষান্তরে গোস্বা আল্লাহর জন্য হলে এতে কোনো প্রকার ফেতনা সৃষ্টি হয় না। কারণ, তখন গোস্বার পাত্র যে হয়, সেও জানে, লোকটি মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষী নয়, বরং আমার কাজের উপর তিনি বিরক্ত। সুতরাং আমি খারাপ, আর সে তো আমার মঙ্গল কামনা করে। সে যা কিছু করছে, আল্লাহর জন্যই করছে। তবে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন কখনও কাম্য নয়। ভারসাম্যপূর্ণ গোস্বাই মূলত আল্লাহর জন্য গোস্বা।

হযরত আলী (রা.) ও তাঁর গোস্বা

হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা। এক ইহুদী একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করে বসলো। আলী (রা.) তা শুনে ফেললেন। তিনি ইহুদীকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। পালাবার পথ না পেয়ে ইহুদী আলী (রা.)-এর মুখে থুতু মেরে বসলো। আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এ কী করলেন? ইহুদী তো আপনার সঙ্গে দ্বিগুণ হঠকারিতা দেখিয়েছে। এজন্য

আপনার তো উচিত ছিলো তাকে আরো মারধর করা। আলী (রা.) উত্তর দিলেন, ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদী যখন আমার প্রিয় নবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করেছে, তখন নবীজীর শানে গোস্তাখি করার কারণে তাকে শাস্তি দিয়েছি। তখনকার গোস্বা আমার নিজের স্বার্থে ছিলো না, বরং ছিলো আল্লাহর রাসূলের ইজ্জত রক্ষার জন্য। কিন্তু যখন সে থুতু নিক্ষেপ করেছে, তখন আমার ক্ষিপ্ততার মাঝে নিজের স্বার্থও জড়িয়ে পড়েছে। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার মনোভাব আমার মাঝে চলে এসেছে। তাই ভাবলাম, নিজের জন্য প্রতিশোধ নেয়া আমার নবীজী (সা.)-এর সুন্নাত নয়। আর এ ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, তখন আমার প্রতিশোধ নেয়াটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হতো না, বরং নিজের জন্য হতো।

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর বাড়ি ছিলো মসজিদে নববীর সঙ্গে লাগোয়া। বাড়ির একটি পরনালার মাথা এসে পড়তো মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়। একবার হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি ওই পরনালার উপর পড়লে তিনি দেখতে পেলেন, ওই পরনালা এসে পড়েছে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়। তাই তিনি রেগে গেলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই পরনালাটি কার? লোকেরা বললো, এটি হযরত আব্বাস (রা.)-এর। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, ভেঙ্গে ফেলো এটি। কারণ, মসজিদের দিকে পরনালা বের করা অবৈধ।

উক্ত ঘটনা হযরত আব্বাস (রা.) এর কানে গেলে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর খেদমতে এসে বললেন, এটা আপনি কী করলেন? হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, পরনালাটি যেহেতু মসজিদে নববীর অংশে এসে পড়েছিলো, তাই তা ফেলে দিয়েছি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, এটা তো আমি লাগিয়েছি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি ক্রমে। একথা শোনামাত্র হযরত উমর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। তারপর উভয়ে যখন ঐখানে পৌঁছলেন, তখন হযরত উমর (রা.) রুকুর মতো ঝুঁকে গিয়ে বললেন, আব্বাস! আল্লাহর দোহাই! আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটি পুনরায় যথাস্থানে লাগিয়ে দিন। কারণ, আল্লাহর রাসূলের অনুমতি নিয়ে লাগানো পরনালা ভেঙ্গে দেয়ার মত দুঃসাহস খাত্তাবের পুত্রের নেই। হযরত আব্বাস বললেন, থাক, আমি পরে লাগিয়ে নেবো। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আব্বাস (রা.)- কে এই বলে তাঁর কোমরে চড়ে লাগাতে বাধ্য করলেন যে, যেহেতু ভেঙ্গেছি আমি, তাই শাস্তিও ভোগ করতে হবে আমাকেই।

এ পরনালাটি আজও স্মারক হিসেবে মসজিদে নববীর সঙ্গে লাগোয়াই আছে। যাঁরা এর পরে মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

মূলত একেই বলে اَحَبَّ لله وَاَبْغَضَ لله এর জীবন্ত নমুনা। যার মাঝে এ গুণ থাকবে, তাঁর ঈমান পরিপূর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।

কৃত্রিম গোস্বা দেখাবে

بُغْضُ فِى الله তথা "আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ-প্রকাশ করতে গেলে কখনও কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে হয়। বিশেষ করে যারা দীক্ষাধীন, তাদেরকে অনেক সময় রাগ দেখাতে হয়। যেমন– ওস্তাদ তাঁর ছাত্রদের উপর, পিতা তাঁর সন্তানদের উপর এবং শায়খ তাঁর মুরিদদের উপর কখনও-কখনও রাগ দেখানোর প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি যেন না হয়– এর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর পদ্ধতি হলো, যে সময় গোস্বা উঠে, ঠিক সেই সময়টাতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না। কারণ, গোস্বার সময় গোস্বা দেখালে অনেক সময় এতে সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। তাই উচিত হলো, পরবর্তীতে যখন মাথা ঠাণ্ডা হবে, তখন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে শাসন করে দেয়া। কাজটি একটু কঠিন। কারণ, গোস্বা সংবরণ করা সহজ কথা নয়। কিন্তু সীমালঙ্ঘন থেকে বাঁচতে এটার অনুশীলন করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে গোস্বার অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির পরিণাম

সন্তান, শাগরিদ বা মুরিদের উপর রাগ করলে এবং এতে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে এর পরিণাম ভালো হয় না। তাছাড়া আপনি যার উপর গোস্বা করেছেন, তিনি যদি আপনার চেয়ে বড় হন কিংবা আপনার সমান হন, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষ তিনি আপনাকে বলে দিতে পারেন যে, আপনার এ বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আপনার থেকে তিনি প্রতিশোধও নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আপনার গোস্বার পাত্র যদি আপনার থেকে ছোট হয়, তাহলে সে না পারে আপনাকে কিছু বলতে এবং না পারে আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে। যেমন ছেলে নিজ পিতা থেকে, শাগরিদ তার উস্তাদ থেকে এবং মুরিদ তার পীর সাহেব থেকে প্রতিশোধ তো দূরের কথা, তাদেরকে কিছু বলারও সাহস করে না। ফলে আপনার অতিথিও রাগের কারণে মনে কষ্ট পেলেও চুপ করে থাকে।

আর তাদের মনোঃকষ্টের ব্যাপারে আপনিও থাকেন উদাসীন। তাই তাদের কাছে মাফ চাওয়ার বিষয়টি আপনি কখনও ভাবেন না। এ কারণেই হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, শিশুদের ব্যাপারটি তো আরো নাজুক। কারণ, তারা তো মাফ করলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশেষে এভাবেই বাড়াবাড়ির গোনাহ আপনার কাঁধে থেকে যায়।

সারকথা

আজকের মজলিসের সারকথা হলো, নিজের ক্রোধকে কাবু করার চেষ্টা করুন। কেননা, ক্রোধ অসংখ্য গুনাহের মূল। এর কারণে সৃষ্টি হয় নানাবিধ আত্মিক ব্যাধি। প্রথমত, চেষ্টা করতে হবে যেন গোস্বা মোটেও প্রকাশ না পায়। দ্বিতীয়ত, এভাবে একে কাবু করতে পারলে দেখতে হবে যে, কোথায় গোস্বা দেখানো যাবে এবং কোথায় তা দেখানো যাবে না। যেখানে গোস্বা দেখানোর বৈধ সুযোগ থাকবে, সেক্ষেত্রে সীমার ভেতরে থেকে গোস্বা দেখানো যাবে।

গোস্বার ভুল ব্যবহার

গোস্বার অনেক সময় ভুল ব্যবহারও হয়। মুখে বলে যে, আমার গোস্বাটা আল্লাহর জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে আমিত্ব, অহঙ্কার ও অন্যকে ছোট জানার মনোভাব। যেমন আমাদের কারো দ্বীনের উপর চলার তাওফীক হলে তখন অনেক সময় আমরা মনে করি দুনিয়ার সবাই খারাপ। আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পরিবারের সবাই খারাপ, এরা তো জাহান্নামী। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এসব জাহান্নামীকে সংশোধন করার জন্য। এ ধরনের মনোভাবের পাল্লায় পড়ে আমরা তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ শুরু করে দিই এবং তাদের হক নষ্ট করা আরম্ভ করি। তারপর শয়তান আমাদেরকে সবক দেয় যে, আমি যা কিছু করি, সবই بُغْضٌ فِي اللهِ তথা আল্লাহর জন্যই করি। শয়তানের এ সবকের কারণে তখন আমরা পদে-পদে মানুষের দোষ ধরি। দুনিয়ার সবাইকে নীচু মনে করি। এভাবে সৃষ্টি হতে থাকে একের-পর-এক সামাজিক অনাচার।

হযরত শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর চমৎকার বাণী

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর একটি বাণী হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো। তিনি বলতেন, হক কথা, হক নিয়তে, হক তরীকায় বললে তা কখনও বৃথা যায় না এবং ফেতনা-ফ্যাসাদও সৃষ্টি হয় না।

তাঁর এ চমৎকার বাণীতে তিনটি শর্তের উল্লেখ রয়েছে, (১) কথা হক তথা সঠিক হতে হবে, (২) নিয়ত হক তথা শুদ্ধ হতে হবে, (৩) তরীকা হক তথা যথাযথ হতে হবে। যেমন– এক মন্দ লোক, তার মন্দ স্বভাব দূর করা প্রয়োজন। সুতরাং দরদমাখা হৃদয় নিয়ে, অত্যন্ত নম্রতাসহ, তাকে হীন মনে না করে তার মন্দ স্বভাবটি ধরিয়ে দিতে হবে। তাকে ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিয়ত থাকতে হবে যে, আল্লাহ যেন তার স্বভাবটা দূর করে দেন। তরীকাও হতে হবে হক। অর্থাৎ দরদ ও নম্রতার মিশেল দিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যদি এ তিনটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে না। যদি কোথাও দেখেন যে, হক কথা বলার কারণে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে প্রবল ধারণা হলো, এ তিনটি শর্তের যে কোনো একটি শর্তের উপস্থিতি সেখানে ছিলো না। হয়ত কথা হক ছিলো না, বা নিয়ত হক ছিলো না কিংবা তরীকা হক ছিলো না।

তোমরা খোদায়ী পুলিশ নও

এটা মনে রাখতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুলিশ হয়ে আসনি। তোমাদের কাজ হলো, হক কথা, হক নিয়তে হক তরীকায় মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেয়া। একাজে বিরক্ত না হওয়া বরং অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। ফেতনা সৃষ্টিকারী কাজের কাছেও যেও না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর দয়া করুন এবং এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য

"বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। পুঁজিবাদ আহত হয়েছে। তাই ইসলামই এখন একমাত্র ভরসা। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের কর্তব্য হলো, দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ করা। মসজিদের পরিবেশে মুসলমান; বাজারের পরিবেশে ক্ষমতার চেয়ারে অমুসলমান। সাবধান! এমনটি যেন না হয়। বরং সব পরিবেশে মুসলমান হতে হবে।"

মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ○

(سورة القصص ٧٧)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।

–(সূরা আল-কাসাস : ৭৭)

শুরুর কথা

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজ আপনাদের সঙ্গে একটি দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি– এ আমার জন্য খোশকিসমত! আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম– 'এওয়ানে সান'আত ও তিজারত তথা 'চেম্বার অফ কমার্স'। এখানে লেকচার দেয়ার জন্য যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা সাধারণত ব্যবসা কিংবা রাজনীতি নিয়েই আলোচনা করেন। আমি রাজনীতিবিদ নই; ব্যবসায়ীও নই, আমি দ্বীনের একজন তালিবে ইলম মাত্র। তাই কোথাও আলোচনা করার সুযোগ পেলে 'দ্বীন' নিয়েই আলোচনা করি। আজকের সেমিনারেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের দ্বীন তো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে তার সুস্পষ্ট শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা।

আজকের আলোচ্য বিষয়

যে দ্বীন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন, তা মসজিদ কিংবা উপাসনালয়গুলোতে সীমাবদ্ধ নয়। এ দ্বীন পরিপূর্ণ। আজকের সেমিনারে আমার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে– 'মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য'। তাই এ বিষয়েই দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখবো, আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে সহীহ কথা, সহীহ পদ্ধতিতে ও সহীহ নিয়তে বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দ্বীন শুধু মসজিদের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়

বাস্তবতা হলো, সমাজ ও রাজনীতির মঞ্চ থেকে মুসলিম উম্মাহ যেদিন বিদায় নিয়েছে, সেদিন থেকে আমাদের মাঝে এক উদ্ভট চিন্তার বাতাস বইতে শুরু করেছে যে, দ্বীন শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম। ফলে যখন আমরা মসজিদে থাকি কিংবা বাসা-বাড়িতে ইবাদতে মশগুল থাকি, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম আমাদের চেতনায় জাগরুক থাকে। কিন্তু যখনই কর্মের ময়দানে এবং সমাজ, রাজনীতি, ব্যবসা ও মার্কেট ইত্যাদির পরিবেশে প্রবেশ করি, তখন ভুলে যাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার কথা।

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন

মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কুরআন মজীদের তেলাওয়াতের মাধ্যমেই হয়।

এ্যাসেম্বলির অধিবেশন, সামাজিক অনুষ্ঠান, শিল্প-কারখানার উদ্বোধন থেকে শুরু করেই সব ধরনের অনুষ্ঠানেই এর প্রচলন। আলহামদুলিল্লাহ এটা অবশ্যই সুখের কথা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপর হল, কুরআন মজীদ যখন তেলাওয়াত করা হয়, তখন কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় আমরা আচ্ছন্ন থাকি আর তেলাওয়াত শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি, তখন ভুলে যাই এ কুরআনের কথা। এটা কুরআন মজীদের প্রতি এক প্রকার অবিচার নয় কি?

কুরআন মজীদ আমাদের কাছে আকুতি জানাচ্ছে

মরহুম মাহির আল-কাদেরী একজন চমৎকার কবি ছিলেন। তিনি কুরআনে কারীমের আকুতি নিয়ে কিছু পঙ্‌ক্তি লিখেছেন। সেখানে কুরআনের যবানিতে কুরআনের আকুতি তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে–

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ✪ خوشبو میں بسایا جاتا ہوں

جب قول و قسم لینے کے لے ✪ تکرار کی نوبت اتی ہے

پھر میری ضرورت پڑتی ہے ✪ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں

অর্থাৎ– আমাকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়, সুগন্ধি লাগানো হয়, ঝগড়া-বিবাদের সময় আমার উপর হাত রেখে কসম করা হয়। যখন প্রয়োজন পড়ে; তখন আমাকে হাতে নিয়ে দেখা হয়। কিন্তু তাদের বাস্তবজীবনে আমি উপেক্ষিত, আমি অবহেলিত।

ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে

আজকের কারী যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছেন, আজকের অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্তই বটে। আয়াতগুলোর মধ্য থেকে একটি আয়াত ছিলো এই–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً ○

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করো।

–(সূরা বাক্বারা : ২০৮)

মসজিদের পরিবেশে মুসলমান, বাজারের পরিবেশে ও ক্ষমতার চেয়ারে অমুসলমান; সাবধান! এমন যেন না হয়। বরং সব পরিবেশেই মুসলমান হও।

'মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য' এটা আমার আজকের বিষয়বস্তু। এ বিষয়ে আমি শুরুতেই কুরআন মজীদের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এর কিছু

বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে রাখি। কিন্তু এর পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলতে হয়। বর্তমান পরিবেশকে সামনে রেখে আয়াতটির সঙ্গে পরিচিত হলে আশা রাখি ফায়দা হবে বেশি।

দুটি অর্থনৈতিক মতবাদ

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'অর্থনীতি'। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে দুটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ আমরা দেখতে পাই। (১) পুঁজিবাদ (২) সমাজতন্ত্র। এ দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আমরা দেখেছি, গত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ দুটি মতবাদ পরস্পর দ্বন্দ্বমুখর। অভিন্ন দর্শন ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৃষ্ট এ দুটি মতবাদের পারস্পরিক লড়াই আমরা দেখেছি। মাত্র চুয়াত্তর বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজতন্ত্রের পতন ও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। দাবী ও শ্লোগানের বাগাড়ম্বরতা ছাড়া সমাজতন্ত্র বিশ্ববাসীকে আর কিছুই দিতে পারেনি। বিশ্বের মানুষ দেখেছে, বাস্তব ও কর্মের ময়দানে সমাজতন্ত্র শুধু ভঙ্গুরই নয়; অসহায়ও। তাই তার ব্যর্থতাই ছিল অনিবার্য।

সমাজতন্ত্র কেন সৃষ্টি হলো?

কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হলো কেন? এর পেছনে কি কোনো করুণ বাস্তবতা রয়েছে? বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে যারা পড়া-লেখা করেছেন, তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, মূলত সমাজতন্ত্র একটি বিকল্প মতবাদ। কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট পুঁজিবাদ ধনী-গরিবের মাঝে যে বিভেদ-দেয়াল তুলেছে এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যে অসমতা তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিরোধকল্পে অস্তিত্ব লাভ করেছিল একটি বিকল্প মতবাদ সমাজতন্ত্র। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ প্রতিটি ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তারই পরিণতিতে দেশের অর্থ যেভাবে ধনিক শ্রেণীর কাছে ছুটে যাচ্ছে, এরই প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ পায় প্রতিবাদী আন্দোলন সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র বলল, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে হলে, সম্পদের সুষম বন্টন পেতে হলে এবং গরিব-কৃষক নিষ্পেষণ বন্ধ করতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া যাবে না; এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রোডম্যাপ মতই কাজ করতে হবে।

পুঁজিবাদের বীভৎসতা মেটেনি

এটা ঠিক যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদের যেসব বীভৎসতা রয়েছে, সমাজতন্ত্র সেগুলোর বিরুদ্ধে শুধু স্লোগান লাগিয়েছে- ইতিবাচক ও বুদ্ধিদীপ্ত কোনো পরিকল্পনা পেশ করতে পারেনি। পারেনি দরিদ্র নিষ্পেষণের এ কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের বাস্তব কোনো পথ দেখাতে। এখানেই সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা। ফাঁকা বুলি আর বাস্তবতা এক নয়। বাস্তবজীবনে সমাজতন্ত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যেসব অসমতা ও বৈষম্য পুঁজিবাদে পাওয়া যায়, সমাজতন্ত্র সেগুলোর সঠিক কোনো সমাধান পেশ করতে পারেনি।

যাদের উপার্জন সবচে বেশি

মজার ব্যাপার হলো, যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিলো, আমেরিকার টাইম্‌স পত্রিকায় তা ফলোআপ করে প্রচার করা হলো এবং এর উপর একটি প্রতিবেদনও ছাপা হলো। টাইম্‌স পত্রিকার ঠিক ঐ সংখ্যাতেই আমেরিকার সমাজব্যবস্থার উপরও একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিলো, যেখানে এ বিষয়ে একটা সমীক্ষা ছিলো আমেরিকান জীবনব্যবস্থার বর্তমানে কাদের উপার্জন সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষাতে লেখা ছিলো যে, আমেরিকান সমাজে যেসব পেশাদার সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে, তারা হলো 'মডেল গার্লস'। মডেলিং যাদের পেশা, তাদের উপার্জন অন্য সব পেশাদারকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনো-কোনো মডেল গার্ল-এর একদিনের উপার্জন পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।

এবার বলুন, মডেল গার্লদের পারিশ্রমিকের এটাকাগুলো অবশেষে কার পকেট থেকে যায়? নিশ্চয় ভোক্তা-সাধারণের পকেট থেকেই। টাইম্‌সের একই সংখ্যায় উক্ত দুটি সংবাদ পড়ে আমি ভাবলাম, আমেরিকা সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে আজ বোগল বাজাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পতনে তারা আজ মহাখুশি। কিন্তু কেন সৃষ্টি হয়েছিল এ সমাজতন্ত্র, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। সমাজতন্ত্র নিশ্চয় বিশ্বমানবতার জন্য দানবের মতই এক আপদ ছিলো, কিন্তু কে এ দানবের জন্মদাতা? পুঁজিবাদ নয় কি? সুতরাং পুঁজিবাদ যদি সঠিক পথে না আসে, তাহলে আরেকটি সমাজতন্ত্র যে জন্মগ্রহণ করবে না, এর নিশ্চয়তা কী?

পুঁজিবাদের মূল সমস্যা

প্রকৃতপক্ষে অর্থ উপার্জনে ব্যক্তিস্বাধীনতা পুঁজিবাদে রয়েছে। এটা পুঁজিবাদের মূল সমস্যা নয়। ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নেয়াটা পুঁজিবাদের মূল ত্রুটি নয়। বরং হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ বিবেচনা না করাটাই

পুঁজিবাদের মূল ত্রুটি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলাম নামক যে দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তার মূল শিক্ষা হলো, মানুষ নিজের জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অবশ্যই স্বাধীন। তবে তা হতে হবে নিজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত নিয়ম-নীতির ভেতরে। অর্থাৎ– অর্থ উপার্জনের ময়দানে ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে স্বাধীনতার নামে যেন মানুষ অবৈধ ফায়দা লুটতে না পারে, সেজন্য এ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধই হলো সে সীমারেখা। সুতরাং মানুষের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির সব বিষয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে হালাল-হারামের সম্পর্ক। এ সীমা রেখা কেউ এড়াতে পারে না। এড়িয়ে চললে ততদিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ আসবে না। সমাজেও দেখা যাবে না শান্তির পরিবেশ।

এক আমেরিকান অফিসার

সুদের ব্যাপারে ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট-এর রায় যে সময় প্রকাশিত হয়েছিলো, ঐ সময় পাকিস্তানের আমেরিকান দূতাবাসের অর্থনীতির ইনচার্জ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি রায়টির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ইতিহাস তখনও তাজা ছিলো। এক পর্যায়ে তাকে বললাম, আমেরিকা এখন দুর্দান্ত। পরিপূর্ণ শক্তিমত্তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, তাই সে-ই এখন বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি। আচ্ছা বলুন তো, সমাজতন্ত্র কেন জন্ম নিয়েছিলো? যেসব কারণে বিশ্বের মানুষ এ মতবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সেসব কারণ কি মিটে গেছে? সমাজতন্ত্রের পতনের পর এ দিকটা আপনারা ভেবেছেন কি? ভেবে দেখার কি প্রয়োজন নেই? পুঁজিবাদের যেসব ত্রুটির কারণে সমাজতন্ত্র জন্ম নিয়েছিলো, সেসব ত্রুটি তো মিটেনি; রয়ে গেছে! সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে এটা যথাস্থানে সঠিক। কিন্তু পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলোর প্রকৃত সমাধান কি? আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কেউ যদি বলে, পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলোর সমাধান আমাদের কাছে আছে– ইসলামের হালাল-হারামনীতিই এর একমাত্র সমাধান। তখন আপনারা তাকে মৌলবাদী বলেন, গোঁড়াবাদিতার অপবাদ দেন। বলেন, লোকটা যুগ-চাহিদা বোঝে না। তাহলে বলুন, আপনাদের ধারণা পুঁজিবাজের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই? শোষণ ও বৈষম্যের প্রতীক পুঁজিবাদই কি একমাত্র সমাধান? আপনারা বিষয়টা নিয়ে এভাবে কেন ভাবছেন না?

ভদ্রলোক খুব গুরুত্বসহ আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো ইসলামের বিধি-বিধান ও শিক্ষার সঙ্গে বৈরি আচরণ করে এটা স্বীকার করি। সুদের ব্যাপারে আপনি যতটা সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে বলেছেন, এতটা গোছালো কথা এ ব্যাপারে আমি এই প্রথম শুনলাম। আমিও মনে করি, এটা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের গণমাধ্যমগুলো প্রোপাগাণ্ডায় অভ্যস্ত। তাই এ জাতীয় কোনো কথা সামনে এলে তারা শুরু করে দেয় অপপ্রচার। এটা অবশ্যই তাদের ভালো নীতি নয়।

ইসলামের অর্থব্যবস্থাই ইনসাফপূর্ণ

আমি বলতে চাচ্ছি, অন্যরা যদি ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের বেলায় আপত্তি তোলে, তাহলে তা হয়ত শিথিল দৃষ্টিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, তারা ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ, ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তাই ইসলাম তাদেরকে কী শিক্ষা দেয়– এটা জানার প্রতিও বিশেষ উৎসাহবোধ নেই। কিন্তু আমরা যারা তাওহীদের কালিমাকে বিশ্বাস করেছি এবং প্রতিটি অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করি, তাদের ইসলামের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। অর্থনীতির ময়দানে ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলোকেও উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। সমাজতন্ত্রের পতন ও পুঁজিবাদের নিপীড়ন–এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ইসলামী অর্থনীতিই ভারসাম্য ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি। মানবতার মুক্তির জন্য এ টেকসই অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। এ বিশ্বাস আজ আমাদের হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে। তারপর শুরুতে আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলাম, তাতে আমাদের জন্য যথেষ্ট পাথেয় আছে।

কারূন ও তার সম্পদ

আয়াতটি সূরা কাসাসের একটি আয়াত। এখানে সম্বোধন করা হয়েছিল কারূনকে। কারূন ছিল মূসা (আ.)-এর যুগের একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। কারূনের ধন-সম্পদের নানা কথা লোক মুখেও প্রসিদ্ধ। তার সম্পদের প্রাচুর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

'তার ধন-ভাণ্ডারের চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য ছিলো। –(সূরা আল কাসাস : ৭৬)

ওই যুগে চাবি বড় ও ভারী হতো। তাছাড়া কারূনের ধন-ভাণ্ডার ছিলো অনেক। আল্লাহ তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে আজকের তেলাওয়াতকৃত আয়াতে। আয়াতটিতে যদিও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে কারূনকে, কিন্তু পরোক্ষভাবে সকল ধনকুবেরই এর সম্বোধিত ব্যক্তি।

কারূনকে চারটি উপদেশ

তেলাওয়াতকৃত আয়াতে রয়েছে চার বাক্যে চারটি উপদেশ। প্রথম বাক্যে আল্লাহ বলেছেন–

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الاٰخِرَةَ ○

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে ধন-ভাণ্ডার দান করেছেন, তা দ্বারা আখেরাতের সফলতা খুঁজে নাও।

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে–

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ○

(এমন যেন না হয় যে, আখেরাতের সফলতা কামনা করতে গিয়ে সকল সম্পদ বিলিয়ে দিবে। বরং) পার্থিব জীবনের যে অংশ আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তা ভুলে যেয়ো না, (তা নিজের কাছে রাখো এবং হক আদায় করো)।

তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে–

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ○

(এ বিশাল সম্পদ দিয়ে) আল্লাহ যেমনিভাবে তোমার উপর দয়া করেছেন, অনুরূপভাবে তুমিও অপরের উপর দয়া করো এবং ভালো ব্যবহার করো।

চতুর্থ বাক্যে বলা হয়েছে–

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ○

(নিজের এ ধনভাণ্ডারের গরমে) পৃথিবীর বুকে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। (সৃষ্টি করার চেষ্টাও করো না।)

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উক্ত চারটি উপদেশ যদিও কারূনকে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো একজন ব্যবসায়ীর জন্য,

শিল্পপতির জন্য। মোটকথা, যে মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা কিছু পার্থিব সম্পদ দান করেছেন, তার জন্য পূর্ণাঙ্গ এক দিক-নির্দেশক।

সম্পদের ব্যাপারে একজন মুসলিম আর অমুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও রয়েছে অনেক তফাৎ। একজন অমুসলিম মনে করে, সম্পদ আমার, আমি যা উপার্জন করেছি নিজের পেশীর জোরে করেছি। খেটেছি, মেধা ও শ্রম দিয়েছি, তারপর সম্পদ উপার্জন করেছি। সুতরাং আমার সম্পদের নিরংকুশ মালিক শুধু আমি। আমার সম্পদের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার অন্য কারো নেই। সুতরাং আমার কাঙ্ক্ষিত সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে আমি যেমন স্বাধীন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমন স্বাধীন।

শু'আইব (আ.)-এর পুঁজিবাদীর মানসিকতাসম্পন্ন জাতি তাঁকে বলতো–

أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ - (سورة هود ٨٧)

অর্থাৎ (আপনি যেসব বিষয়ে আমাদেরকে নিষেধ করছেন যেমন–মাপে কম দিয়ো না, ইনসাফের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করো, হারাম থেকে বেঁচে থাকো। আমরা তো দেখছি এর মাধ্যমে আপনি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাপারে নাক গলানো শুরু করে দিয়েছেন। আপনি নামায পড়তে চাইলে ঘরে গিয়ে পড়ুন) আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করতো? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব?

আমার সম্পদ আমি যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবো এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবো– পুঁজিবাদের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূলত শু'আইব (আ.) এর জাতিরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। আল্লাহ সেই জাতির এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য বলেছিলেন–

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ○

'আসমান ও যমীনের সবকিছুরই মালিক আল্লাহ । –(সূরা নিসা : ১৩১)

তাই তিনি তোমাকে যা কিছু দান করেছেন, তার দ্বারা আখেরাতের সফলতা খোঁজ করো।

প্রথম উপদেশ

সুতরাং প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে– নগদ টাকা, ব্যাংক-ব্যালেন্স, ব্যবসা, শিল্প-কারখানা–এসবই আল্লাহর দান। তোমাদের মেধা ও শ্রম অবশ্যই এগুলোর পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু মেধা বা শ্রমই সবকিছু নয়। দেখো, কত মেধাবী মেধা খরচ করে যাচ্ছে, কত পরিশ্রমী হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে যাচ্ছে, অর্থচ তোমার মত ধন-সম্পদ তার নেই। সুতরাং বোঝা গেলো, সম্পদ অর্জনের পেছনে মেধা-শ্রমের ভূমিকা অবশ্যই আছে; কিন্তু এগুলোই সবকিছুই নয়। বরং এ সম্পদ আল্লাহর দান। وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ আর আল্লাহর দানকৃত এ সম্পদ দ্বারা আখেরাত সাজাও। দেখুন, আল্লাহ এভাবে বলেন নি যে, وَابْتَغِ فِيْ مَالِكَ তোমার সম্পদ দ্বারা আখেরাত সাজাও। বোঝা গেল, সম্পদ আল্লাহরই দান।

মুসলমান এবং অমুসলমানের মাঝে তিনটি পার্থক্য

মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে তিনটি পার্থক্য রয়েছে। (১) মুসলমান নিজের সম্পদকে মনে করে এগুলো আল্লাহর দান। (২) মুসলমান নিজের সম্পদকে আখেরাতের সফলতার ভিত্তিতে খরচ করে। উপার্জনের সময়ও হালাল পদ্ধতি অবলম্বন করে। ফলে তাও আখেরাতের জন্যই হয়। আসলে নিয়ত শুদ্ধ হলে দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যেতে পারে। যেমন সম্পদ উপার্জনের সময় হালাল-হারামের প্রতি যত্নশীল হওয়ার নিয়ত করলে এ সম্পদই আখেরাতের সফলতার কারণ হতে পারে। (৩) একজন মুসলমান পানাহার করে। অমুসলমানও করে। কিন্তু অমুসলিমের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ থাকে না। পক্ষান্তরে মুসলমানের অন্তরে থাকে। তাই অমুসলিম হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। পক্ষান্তরে মুসলমান তা করে। এজন্যই মুসলমানের দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অমুসলিমের দুনিয়া দুনিয়াই থাকে।

দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ী

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

(ترمذى ، كتاب البيوع ، باب ماجاء فى التجارة)

অর্থাৎ– একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু ব্যবসায়ীর মাঝে যদি সহীহ নিয়ত না থাকে এবং হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে, তার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন–

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ –

এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন অকৃতজ্ঞ, নাফরমান, গুনাহগার ও ফাসিক অবস্থায় উত্থিত হবে। তবে যে শ্রেণী তাকওয়া অর্জন করেছে, সহীহ নিয়তে, সহীহ পদ্ধতিতে ব্যবসা করেছে এবং সত্যকথা বলেছে, তারা ব্যতীত। অর্থাৎ– তারা তো প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় উপদেশ

প্রথম উপদেশের কারণে কারো মনে এ চিন্তা আসতে পারে যে, ইসলাম তো দেখি আমাদের জন্য ব্যবসার দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে এবং বলেছে, শুধু আখেরাত দেখ, দুনিয়া দেখো না, দুনিয়ার মাঝে নিজের প্রয়োজনাদীর খেয়াল করো না। তাই কুরআন মাজীদ এ জাতীয় চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয় বাক্যে বলেছে–

وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ○

অর্থাৎ– ইসলামের বক্তব্য এটা নয় যে, তোমরা দুনিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও। বরং দুনিয়ার অংশকেও তোমরা ভুলে যেও না। জায়েয ও হালাল পদ্ধতিতে দুনিয়া কামাও।

দুনিয়াই সবকিছু নয়

কুরআন মাজীদের বক্তব্যের ধরনই অন্যরকম। দেখুন, এখানে এ বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অর্থনীতিই মানুষের সবকিছু নয়। ইসলাম অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলে অর্থনীতিই জীবনের সবকিছু নয়। একজন মুমিন এবং কাফিরের মাঝে এটাই বড় পার্থক্য যে, কাফির অর্থনীতিকেই মনে করে জীবনের সবকিছু আর মুমিন তা মনে করে না। বরং সে মনে করে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, যেকোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সুতরাং আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা।

মানুষ কি Economic animal বা অর্থ-উৎপাদক জন্তু?

মানুষের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, মানুষ Economic animal এ সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে তো মানুষ আর গরু, গাধা ও কুকুরের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। কারণ, এরা পানাহারকেই সবকিছু মনে করে। আর মানুষও যদি তা-ই মনে করে, ত'াহলে তার মাঝে এবং জন্তুর মাঝে পার্থক্যটা কোথায়? মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই তাকে ভাবতে হবে যে, এজীবন ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আর চিরস্থায়ী জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়েও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় উপদেশ

তৃতীয় উপদেশে বলা হয়েছিলো–

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ -

অর্থাৎ ধন-সম্পদ দান করে আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপভাবে তোমারাও অন্যের উপর অনুগ্রহ করো।

সুতরাং এ আয়াতে যেমনিভাবে হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে, তোমার উপার্জিত হালাল সম্পদের একচ্ছত্র মালিকও তুমি নও। বরং এর মাঝে অন্যের হক আছে। যাকাত, সদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে সে হক আদায় করো।

চতুর্থ উপদেশ

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ -

জমিনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। অর্থাৎ অপরের হক মেরো না। অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করো না। বাজার-সংকট সৃষ্টি করো না।

এ চারটি উপদেশ মেনে চললে ঐ ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে হাশর করতে পারবে। অন্যথায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ যাবে। সবই আখেরাতে আযাবের কারণ হবে।

বিশ্বের সামনে নমুনা পেশ করুন

বর্তমানে আমাদের মুসলিম ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল, কুরআন মাজীদের উক্ত চারটি উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশ

করতে হবে। বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, পুঁজিবাদ আহত হয়েছে। তাই ইসলামই একমাত্র ভরসা। আর এর নমুনা পেশ করতে হবে আপনাদেরকেই।

আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখুন

"গুনাহের প্রতি ঘৃণাবোধ বর্তমানে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। এমনকি গুনাহের অনুভূতিও আমাদের মাঝে নেই। এর প্রধান কারণ হলো, আমাদের ধন-সম্পদের ভেতর হারামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক প্রকারের হারাম সুস্পষ্ট যেমন— সুদ, ঘুষ ইত্যাদি। আরেক প্রকারের হারাম, যেটি সম্পর্কে আমরা উদাসীন। এরই ক্ষেত্র হলো 'লেনদেন'।

লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (سورة النساء ٢٩)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।"

–(সূরা নিসা : ২৯)

স্বচ্ছ লেনদেন দ্বীনের একটি অন্যতম অংশ

লেনদেনে পরিশুদ্ধতা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়াতটিতে এ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং পারস্পরিক লেনদেন স্বচ্ছ হতে হবে। লেনদেন হওয়া উচিত উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ও সম্মতিতে। এটিও দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ বিষয়টির প্রতি চরম অবহেলা বর্তমানের প্রায় সকলেই করছে। আমরা ধারণা করে বসে আছি যে, দ্বীন মানে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত। নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির মাঝেই আমরা দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। লেনদেনের মাঝে স্বচ্ছতা আমাদের কাছে এক অপাঙক্তেয় বিষয়। অথচ ইসলামের বিধিবিধান মন্থন করলে দেখা যায় যে, ইবাদত-সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো ইসলামের এক চতুর্থাংশ মাত্র। অবশিষ্ট তিন অংশ লেনদেন ও জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দ্বীনের এক চতুর্থাংশ

'হিদায়া' একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। সব মাদরাসাতেই পড়ানো হয়। সব আলেমই এটি পড়ে আলেম হয়েছেন। শরঈ আহকাম ও মাসাইল সংক্রান্ত কিতাব এটি মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ইবাদত-সংক্রান্ত বিধানবলী। অবশিষ্ট তিন খণ্ড লেনদেন, আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত। প্রতীয়মান হয়, দ্বীনের তিন চতুর্থাংশই লেনদেন সংক্রান্ত।

অস্বচ্ছ লেনদেন : ইবাদতে তার প্রতিক্রিয়া

লেনদেন প্রতিক্রিয়াশীল। মানুষ যদি লেনদেন পরিশুদ্ধ না রাখে, হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া ইবাদতেও পড়ে। ইবাদত আদায় হলেও কবুল হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অনেকে এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়ে আনত হৃদয়ে কান্নাকাটি করে। তাদের চুলগুলো এলোমেলো, হাউমাউ করে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহকে ডাকে, 'হে আল্লাহ! আমার মাকসাদ পূরণ করুন। অথচ পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম। পানাহার হারাম। শরীরের গোশত-চর্বি হারাম খাদ্য থেকে তৈরি। আল্লাহ এদের দু'আ কিভাবে কবুল করবেন?

যার ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত কঠিন

ইবাদতের মাঝে অবহেলা থাকলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। কোনো নামায ছুটে গেলে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নেয়া যায়। মরে গেলে অসিয়ত

অনুযায়ী তার সম্পদ থেকে কাফফারা আদায় করা যায়। তাওবার মাধ্যমেও এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে। কিন্তু অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ তখনই সম্ভব, যখন সম্পদের প্রকৃত মালিক থেকে মাফ নেয়া যায়। অন্যথায় হাজারবার তাওবা করলেও বা শতবার নামায পড়লেও এর ক্ষমা নেই।

হযরত থানবী (রহ.) ও লেনদেন

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি লেনদেনের শুদ্ধতাকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, আমার কোনো মুরিদের ব্যাপারে যখন আমি জানতে পারি যে, সে নিয়মিত যিকির-আযকার, নফল ইবাদত ও আমলের ব্যাপারে অবহেলা করে, তখন অন্তরে ব্যথা পাই। কিন্তু কোনো মুরিদের ব্যাপারে যদি জানতে পারি যে, সে ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন করে, তখন তার প্রতি আমার অন্তরে ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার থানবী (রহ.)-এর এক খলিফা নিজের ছেলেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে এলেন। ছেলেটিকে তিনি হযরতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দু'আর আবেদন করলেন। থানবী (রহ.) ছেলেটির জন্য দু'আ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির বয়স কত? খলিফা জানালেন, এর বয়স তের বছর। থানবী (রহ.) বললেন, আপনি তো ট্রেনযোগে এসেছেন, এর জন্য হাফ টিকেট কেটেছেন, না ফুল টিকেট? খলিফা উত্তর দিলেন, হাফ টিকেট কেটেছি। হযরত বললেন, বার বছরের বেশি এর বয়স, তবুও হাফ টিকেট কাটলেন কেন? খলিফা উত্তর দিলেন, দেখতে বার বছরের মত মনে হয় তাই হাফ টিকেট কেটেছি। সঙ্গে-সঙ্গে থানবী (রহ.) বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তরিকত ও তাসাউফের বাতাসও আপনার শরীরে লাগেনি। আপনি একটুও ভাবলেন না যে, ছেলেটার সফর হারাম পদ্ধতিতে হয়েছে। আপনি টিকেটের অর্ধেক মূল্য চুরি করেছেন আর এমন চোর আমার খলিফা হতে পারে না। সুতরাং বাই'আতের অনুমতি আজ থেকে আপনার নেই।

দেখুন, লোকটির সব আমল ঠিক থাকা সত্ত্বেও তার খেলাফত চলে গেলো একমাত্র লেনদেনের অসচ্ছতার কারণে।

থানবী (রহ.)-এর একটি ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) সকল মুরিদকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তখন তোমরা ট্রেনে সফর করবে, তখন যতটুকু মাল-সামানা বিনা ভাড়ায় নেয়ার অনুমতি আছে, ঠিক সেই পরিমাণ বিনা ভাড়ায় নেবে। এর অতিরিক্ত হলে ওজন করে নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করে দিবে।

হযরতের নিজের ঘটনা। একবার তিনি ট্রেনে সফল করার উদ্দেশ্যে স্টেশনে পৌছলেন। হাতে সময় কম। ট্রেন আসারও সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর থানবী (রহ.) নিজের মাল-সামানা নিয়ে ওজন করার উদ্দেশ্যে লাইনে দাঁড়ালেন। গার্ড বলে উঠলো, হযরত, লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? থানবী (রহ.) উত্তর দিলেন, মালপত্র ওজন করার জন্য। গার্ড বললো, ওজন করার প্রয়োজন নেই। আপনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি এ গাড়িতেই যাচ্ছি। সুতরাং আপনাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে না। থানবী (রহ.) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে কতটুকু যাবেন? গার্ড জানালো, অমুক স্টেশন পর্যন্ত। থানবী (রহ.) বললেন, এপর কী হবে? গার্ড বললো, ওই স্টেশনে অন্য গার্ড আসবে; আমি তাকে বলে দেবো। থানবী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, সে গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে? গার্ড বললো, সে যে স্টেশন পর্যন্ত যাবে, এর আগেই আপনার স্টেশন শেষ। থানবী (রহ.) বললেন, আমি আরো আগে যাবো। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যাবো, নিজের কবরে যাবো। সেখানে কি কোনো গার্ড থাকবে? আল্লাহর সামনে তখন আমাকে চোর সাব্যস্ত করা হবে, তখন কে সাহায্য করবে?

গোটা জীবন হারাম হয়ে যাচ্ছে

কোনো ব্যক্তি রেল স্টেশনে মালপত্র ওজন করতে গেলে মানুষ মনে করত, লোকটি থানাভবনের যাত্রী এবং থানবী (রহ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। থানবী (রহ.) এর অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়টিও সেখানে প্রসিদ্ধ ছিল। লেনদেন পরিশুদ্ধ রাখে এমন লোকের আজ বড়ই অভাব। লেনদেন শরীয়ত-সমর্থিত হচ্ছে কিনা– এ ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা নেই। দেখুন, অসৎ উপায়ে কিছু টাকা-পয়সা হয়ত বাঁচিয়ে নিলাম; কিন্তু হারামের কারণে তা হালাল ও পবিত্র অর্থের সঙ্গে মিলে একটা প্রভাব সৃষ্টি করে। আর সেই অর্থই আমরা ভোগ করি এবং যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিই, যার ফলে আমাদের গোটা জীবন পরিচালিত হচ্ছে হারাম পথে। আমাদের অনুভূতি আজ শূন্যের কোটায়। তাই হারামের কুফল আমরা টের পাই না। এ হারাম মাল আমাদের জীবনকে কিভাবে বিষিয়ে তুলছে, তা ভেবে দেখি না। আল্লাহ যাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, তারা এর কুফল বুঝতে পারে অবশ্যই।

মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)-এর খাবারের কয়েকটি সন্দেহযুক্ত লোকমা গ্রহণ

মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.) এক বাড়িতে দাওয়াত খেলেন। পরে জানতে পারলেন, খাবার সন্দেহযুক্ত ছিল। তিনি বলেন, এক মাস পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া আমি অনুভব করি। বিভিন্ন প্রকারের গুনাহের প্রতি তখন আমার আগ্রহ জাগতো। এটা ছিল হারাম খাবারের কুফল।

হারাম দুই প্রকার

গুনাহের প্রতি ঘৃণাবোধ বর্তমানে আমাদের মাঝে নেই। গুনাহের অনুভূতিও আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, আমাদের ধন-সম্পদের সঙ্গে হারাম মালের মিশ্রন ঘটছে। এক প্রকারের হারাম সুস্পষ্ট। যেমন সুদ, ঘুষ ইত্যাদি। আরেক প্রকারের হারাম, যেটি সম্পর্কে আমরা উদাসীন। এর ক্ষেত্র হল 'লেনদেন'।

মালিকানা থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট

পারস্পরিক লেনদেন হতে হবে নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত। এমনকি আপন ভাইদের মাঝে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হলেও। মালিকানার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। কোনটি পিতার, কোনটি সন্তানের, স্বামীর মালিকানাধীন কোনটি, স্ত্রীর কোনটি ইত্যাদি স্পষ্ট থাকা চাই। ভাইদের মাঝেও এ স্পষ্টতা থাকা আবশ্যক। এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা। তিনি ইরশাদ করেছেন–

تَعَاشَرُوْا كَالْاِخْوَانِ، تَعَا مَلُوْا كَالْاَجَانِبِ

'ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কসহ জীবন যাপন করো আর লেনদেন করো অপরিচিতজনদের মত।'

পিতা-পুত্রের যৌথ ব্যবসা

বর্তমানে আমাদের সব কারবার অস্বচ্ছ। পিতা-পুত্রের পারস্পরিক কারবারেও এ সমস্যাটি দেখা যায়। পিতা-পুত্র যৌথ ব্যবসা করছে, অথচ তা কি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, না কর্মচারী হিসাবে, না সহযোগিতার ভিত্তিতে এসব বিষয় স্পষ্ট থাকে না। দোকানদারি চলছে, বেচা-কেনা হচ্ছে, কিন্তু জানা নেই কার অংশ কতটুকু? যদি বলা হয়, লেনদেন পরিষ্কার করে নাও, তাহলে উত্তর

আসে, ভাই-ভাইয়ে ব্যবসা। এতে আবার কথাবার্তা কিসের? কথাবার্তা তো অন্যদের ক্ষেত্রে। নিজেদের মধ্যে আবার কিসের চুক্তিপত্র! এর কুফল প্রকাশ পায় বিয়ে করার পর। এক ভাইয়ের খরচের পরিমাণ বেশি, আরেক ভাইয়ের কম। একজন বাড়ি নির্মাণ করল, অন্যজন করতে পারলো না। এর মধ্যে পিতা মারা গেলেন। তখনই জ্বলে ওঠে ক্ষোভের আগুন। তখন অশান্তি ও বিবাদের সীমা থাকে না। সমাধানের জন্যও কোনো দরোজা-জানালা পাওয়া যায় না।

পিতার মৃত্যুর পরপরই উত্তরাধিকার বণ্টন

পিতা মারা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পত্তি বণ্টন করে নেয়া উচিত। বণ্টনে দেরি করা অন্যায়। বর্তমান সমাজে এর বিপরীত দেখা যায়। পিতার মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিপতি সেজে বসে তার বড় সন্তান। অন্য সন্তানেরা চুপ মেরে বসে থাকে। এভাবে দশ-বার বছরও চলে যায়। এমনও হয় যে, এ দীর্ঘ সময়ে কোনো ভাইয়ের মৃত্যু হয়ে যায়। আবার এমনও হয় যে, পিতার ব্যবসার মধ্যে বড় ভাই অর্থ ও শ্রম দিয়েছিল। বহুদিন পর সে ভাইয়ের সন্তানেরা প্রতিবাদ জানায়। এভাবে ঝগড়া-বিবাদ যখন তুঙ্গে পৌঁছে, তখন সকলে মিলে মুফতী সাহেবের নিকট যায়। কিন্তু মুফতী সাহেব সমাধান দিতে অক্ষম। কারণ, বড় ভাই পিতার সঙ্গে কোন হিসাবে অংশীদার ছিলো তা জানার কোনো পথ পাওয়া যায় না।

যৌথ একটি বাড়ি বানানো হলো। এতে পিতা-পুত্র উভয়ের অর্থ ব্যয় হলো। জানা যায়নি যে, কে কিভাবে ব্যয় করেছিলো। তা কি ঋণ হিসাবে, না অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, নাকি সহায়তা হিসাবে। বাড়ি বানানোর পর বসবাস শুরু হলো। এক সময় পিতা মারা গেলো। এবার দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রকমের সমস্যা, সীমাহীন সমস্যা, বিবাদের ভারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠলো। অবশেষে সবাই মুফতী সাহেবের কাছে সমাধানের জন্য গেলো। এক ভাই দাবী করলো, আমি এ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছি। সুতরাং আমি এত অংশের মালিক। অন্যজনও অনুরূপ দাবী করে বসলো। যখন তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, ভাই, বিনিয়োগের সময় আপনার নিয়ত কি ছিলো? ঋণ হিসাবে দিয়েছিলেন, না অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, না সহযোগিতা হিসাবে? তখন জবাব দেয়, পিতা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। এবার বলুন তো মুফতী সাহেব সমাধান দিবেন কিভাবে? এতসব সমস্যার মূল কারণ একটাই। আর তাহলো, রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতা। আফসোস! নফল, তাহাজ্জুদ ও ইশরাকের মূল্য থাকলেও, অনেকের কাছে লেনদেনের বিশুদ্ধতার কোনো মূল্য নেই।

এক্ষেত্রে মুফতী শফী (রহ.) কর্মকৌশল

আমি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)কে দেখেছি যে, তার কামরায় একটি খাট ছিলো। যেখানে তিনি আরাম করতেন। আমি দেখেছি, যখন বাইরে থেকে কোনো জিনিস তার কামরায় আসতো, পরক্ষণেই তা ফিরিয়ে দিতেন। যেমন তিনি পানি চাইলেন, আমি গ্লাসে করে পানি আনলাম। তিনি পান শেষে সঙ্গে-সঙ্গে বলতেন, গ্লাস ফেরত দিয়ে এসো। দেরী করলে খুব রাগ করতেন। থালা-বাটি এলে পরক্ষণেই তা বাবুর্চিখানায় ফিরিয়ে দিতেন। একদিন বললাম, আব্বাজান! জিনিসপত্র ফেরত পাঠাতে বিলম্ব করলে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন, ব্যাপার হলো, আমি আমার অসিয়তনামায় লিখেছি, এ কামরায় বিদ্যমান জিনিসপত্র আমার। আর অন্য কামরায় যা রয়েছে, তা তোমার মায়ের। তাই ভয় হয় যে, অন্য কামরার কোনো জিনিস আমার কামরায় এলো আর ওই মুহূর্তে আমার মৃত্যু চলে এলো। তখন তোমরা ভাববে যে, এটা আমার মাল, অথচ আমার নয়। এজন্য আমি সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেই।

ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর সতর্কতা

আব্বাজান যখন ইনতেকাল করলেন, তখন হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) সমবেদনা প্রকাশের জন্য এলেন। আব্বাজানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু তা বলে বুঝানো যাবে না। আমার মনে হলো, হযরত অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাই আমি আব্বাজানের সালসা নিয়ে এলাম। হযরতের সামনে পেশ করে বললাম, হযরত! এখান থেকে একটু পান করে নিন; দুর্বলতা কেটে যাবে। হযরত বললেন, এটা কেন আনলে? এটা তো উত্তরাধিকারী সম্পদের অংশ। তোমার আব্বার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক তুমি একা নও যে, কাউকে দিতে পারবে। এমনকি সামান্য অংশও কাউকে দেয়ার মালিক তুমি একা নও। আমি বললাম, হযরত! আব্বার সন্তানেরা সবাই এখানে আছে। আপনি পান করলে সবাই খুশি হবেন। তখন হযরত সালসাটি নিলেন।

সেদিনই হিসাব করে রাখ

তারপর তিনি বললেন, শোনো, অন্তরে গেঁথে রাখো। যদি ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় কিংবা অনুপস্থিত থাকে বা কেউ অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এ সালসার এক চামচও হারাম হবে। তাই নিয়ম হলো, কারো মৃত্যুর পরপরই তার পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করে দেয়া। কমপক্ষে হিসাব করে রাখা যে, অমুক এতটুকু পাওনা। এটা এজন্য যে, অনেক সময় বণ্টন করতে সময়

লাগে, জিনিসপত্রের মূল্য ঠিক করার প্রয়োজন হয়। কিছু জিনিস বিক্রি করতে হয়। তবে হিসাব ওই দিনেই করতে হবে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ হয় হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার না থাকার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও তাঁর আত্মশুদ্ধিমূলক কিতাব

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। ফিকাহশাস্ত্র আমরা আজ তাঁর লেখনীর বরকতেই পেয়েছি। তাঁর এ দানের প্রতিদান আমরা কিছুতেই দিতে পারবো না। তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি কয়েক উটের বোঝা হতো। একবার এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হযরত! আপনি এত কিতাব লিখলেন, কিন্তু তাসাউফের উপর কোনো কিতাব লিখলেন না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, কে বললো এমন কথা! তুমি কি আমার রচিত বেচাকেনার অধ্যায় দেখনি? এটাই তো তাসাউফ। কেননা, বেচাকেনা পরিশুদ্ধ হওয়া আত্মশুদ্ধির প্রধান মাধ্যম। শরীয়তের বিধিবিধান যথাযথভাবে আদায় করার নামই তো আত্মশুদ্ধি।

অপরের জিনিস ব্যবহার করা

অনুমতি ছাড়া অপরের জিনিস ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি এ বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় থাকে যে, আমি ব্যবহার করলে সে অসন্তুষ্ট হবে না, বরং খুশি হবে, তাহলে ব্যবহারের অবকাশ আছে। যেমন ভাই-বন্ধু। এদের জিনিসপত্রও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা না-জায়েয। নিজের ভাই হোক, ছেলে হোক, পিতা হোক- যদি কারো ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকে যে, অনুমতি ছাড়া জিনিসটি ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

হাদীস শরীফে এসেছে–

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ -

(كنـــزالعمال ، حديث : ٣٩٤)

কোনো মুসলমানের মালপত্র ব্যবহার তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

এ হাদীসে শুধু 'অনুমতি'র কথা বলা হয়নি। বরং 'স্বতঃস্ফূর্ততার' কথা বলা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, অনুমতির পাশাপাশি সন্তুষ্টিও থাকতে হবে। আফসোস! বর্তমানে আমরা এর প্রতি কোনো তোয়াক্কা করি না। অপরের জিনিসপত্র অনুমতি ছাড়া যথেচ্ছ ব্যবহার করছি। অথচ এটা হারাম।

এমন চাঁদা বৈধ নয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, কিছু কিছু সংগঠন আছে, যারা এমন কৌশলে চাঁদা তোলে যে, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। এটা না-জায়েয। যেমন– এক সমাবেশে চাঁদা উঠানো হচ্ছে। তখন এক ব্যক্তির মনে এ ধারণা চাঁপলো যে, আমি না দিলে নাক কাটা যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে চাঁদা দিতে হলো। সুতরাং এ জাতীয় চাঁদা না-জায়েয।

প্রত্যেকের মালিকানা থাকবে সুস্পষ্ট

ছেলে, ভাই, পিতা, বন্ধু-বান্ধব– মোটকথা যে-ই হোক না তার জিনিসপত্র ব্যবহার করলে অনুমতি লাগবেই। এটা শরীয়তের বিধান। এ বিধানটির প্রতি অবহেলা করার কারণে আমাদের সম্পদের মাঝে হারাম একাকার হয়ে যাচ্ছে। এক ব্যক্তি সর্বজনস্বীকৃত অবৈধ পন্থাগুলো বর্জন করলো। যেমন চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি ইত্যাদি উপায়ে সম্পদ উপার্জন করলো না, অথচ শরীয়তের এ বিধানটির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করলো, তবে সেও হারামের মধ্যে পড়ে গেলো। ফলে এ সম্পদ খেয়ে তার অন্তরে পাপের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রত্যেকের মালিকানা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে। আর পারস্পরিক জীবন-যাপনে বজায় রাখতে হবে ভ্রাতৃত্ব।

মসজিদে নববীর ভূমি বিনামূল্যে গ্রহণ না করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম তিনি শুরু করেন মসজিদ নির্মাণের কাজ –মসজিদে নববী। যে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায় পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের সমান। মদীনায় বনু নাজ্জারের একটি খোলামেলা জায়গা ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করার চিন্তা-ভাবনা করেন। এটা জানতে পেরে বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এলেন এবং জায়গাটি বিনামূল্যে দান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বলে অস্বীকার করলেন যে, তোমরা এর জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দাও। তারা স্বতস্ফূর্তভাবে জায়গাটি দান করতে চাইলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তা গ্রহণ করেননি।

মসজিদ নির্মাণে চাপ সৃষ্টি

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, বনু নাজ্জারের এ জায়গাটি বিনামূল্যে গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করলে কোনো ক্ষতি ছিলো না।

কিন্তু এটা যেহেতু মদীনার মসজিদ, যে মসজিদ পরবর্তী ইতিহাসে কা'বা শরীফের পরের স্থান দখল করবে, তাই দানকৃত জমিন গ্রহণ করাটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দ ছিলো না। কারণ, এতে হয়ত ভবিষ্যতের মানুষেরা ভাববে যে, জমিন ক্রয় না করে বরং বিনামূল্যে গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত।

গোটা বছরের খরচ দান

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষেই যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে সেখানে আখেরাতের ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। এরপরও রাসূলুল্লাহর (সা.) বছরের শুরুতে গোটা বছরের খরচ সকল স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, এটা তোমাদের খরচের জন্য, এর মধ্যে তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আর তাঁরাও এ থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন।

স্ত্রীদের সঙ্গে সম-অধিকার রক্ষা করে চলা

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে অধিকার দিয়েছিলেন স্ত্রীদের ব্যাপারে কম-বেশি করার। কাজেই সকল স্ত্রীর মাঝে সম-অধিকার রক্ষা করে চলা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিলো না। পক্ষান্তরে উম্মতের জন্য অপরিহার্য হলো, একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করে চলা। এরপরেও রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের ব্যাপারে আজীবন সমতা রক্ষা করে চলেছেন এবং প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি রেখেছেন। সারকথা, আলোচ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লেনদেন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট রাখতে হবে। কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা থাকা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর হাকীকত ও হুকুম বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সংক্ষেপে ইসলাম

"দেখুন, প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলো এ কমিউনিজম বা সোস্যালিজম। যে মতবাদটি ছিলো মানববুদ্ধিরই একটি প্রসব। সাম্য ও সম্প্রীতির কথা বলে যে গোটা বিশ্বকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলো। কমিউনিউজমের জয়গানে তখন পুরো বিশ্ব কেঁপে উঠেছিলো। এমনও বলতে শোনা গেছে, গোটা বিশ্বব্যাপী শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজমের শাসন। দেখা গেছে, কেউ যদি তাদের এ ভুল চিন্তাধারার প্রতি আঙ্গুল তুলতো, তাকে বলা হতো বুর্জোয়াদের এজেন্ট, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, রক্ষণশীলসহ আরো কত কী। কিন্তু চুয়াত্তর বছরের তিক্ততার পর আজকের পৃথিবী দেখছে, যে লেনিনের পূঁজা করা হতো, তার ভক্তরাই ভেঙ্গে খান-খান করে দিচ্ছে তার মূর্তিকে। মূলত অহীর শিক্ষা থেকে মুক্ত শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল মতবাদের পরিণতি এমনই হয়। হঠাৎ করে যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক, তার পরিণতিটা হয় খুবই করুণ ও বীভৎস। এজন্যই বলি, যদি জীবনটাকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে চালাতে চাও, তাহলে ইসলামের কাছে মাথা নুইয়ে নাও।"

সংক্ষেপে ইসলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ (سورة البقرة : ٢٠٨)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

–(সূরা বাকারা : ২০৮)

শুরুর কথা

মুহতারাম উপস্থিতি! প্রথমেই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এজন্য যে, দ্বীনের কিছু কথা শোনার জন্য আপনারা সময় বের করেছেন। আপনাদের এ জবাবকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এখানে আপনারা একত্র হয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে কিছু কথা শোনার জন্য। আল্লাহ আপনাদের এ জবাবকে কবুল করুন। আলোচক ও শ্রোতা সকলকেই আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কুরআন মজীদের একটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এ আয়াতের আলোকে কিছু কথা বলার ইচ্ছা করছি। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তনের পেছনে চলো না।

ইসলাম ও ঈমান

"হে ঈমানদারগণ! আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এভাবেই সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ যারা কালেমায়ে তাইয়েবা ও কালেমায়ে শাহাদাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তা প্রকাশও করেছে, তারাই ঈমানদার। এদেরকেই আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো।

ভাবনার বিষয় হলো, ঈমান আনার পর ইসলামে প্রবেশের অর্থ কী? সাধারণত আমরা মনে করি, ঈমান আনা মানেই ইসলামে প্রবেশ করা। ঈমান ও ইসলাম অভিন্ন বিষয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! ইসলামে প্রবেশ কর।" এতে বোঝা যায় ঈমান এবং ইসলাম এক নয়, বরং ভিন্ন দু'টি বিষয়। শুধু ঈমান আনলেই হয় না, বরং এরপরে ইসলামেও অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

ইসলাম কাকে বলে?

ইসলাম কাকে বলে? 'হে ঈমানদারগণ! ইসলামে প্রবেশ করো' আল্লাহর এ আহ্বানের তাৎপর্য কী? সর্বপ্রথম এসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন।

ইসলাম আরবী শব্দ। নিজেকে কারো সামনে অবনত করা, কোনো শক্তির সামনে নিজেকে মিটিয়ে দেয়া, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাসহ কারো কথা মেনে চলা এসবই 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মুখে কালেমা উচ্চারণ করে নেয়ার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলামে প্রবেশ করতে হলে নিজের সর্বস্বকে মিটিয়ে দিতে হবে আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার সামনে। এছাড়া একজন মানুষ কখনও প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারে না।

সন্তানকে জবেহ করার নির্দেশ ছিলো অযৌক্তিক

এ 'ইসলাম' শব্দটিই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ).-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রিয় এ সন্তানটিকে জবাই করার জন্য। ঈদুল আযহার কুরবানী উৎসব এ ঘটনারই পবিত্র স্মারক। ইসমাঈল (আ.) তো আর সাধারণ কোনো সন্তান ছিলেন না। তিনি তো ছিলেন পিতা ইবরাহীমের দু'আ, 'হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেক সন্তান দান করুন'। এরই প্রেক্ষিতে জন্ম নিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। তারপর একসময় শৈশব ছাড়িয়ে তারুণ্যে পৌঁছলেন। পিতার একাজ ওকাজ করে দেয়ার মত উপযুক্ত হলেন। আর তখন এলো পিতার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ যে, সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে দাও।

বুদ্ধির নিরিখে, যুক্তির বিচারে ও তর্কের মানদণ্ডে এ ছিলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি নির্দেশ। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর এ নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

সন্তানেরও পরীক্ষা হয়ে গেলো

বরং ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাই ছেলেকে বিষয়টি অবহিত করে জিজ্ঞেস করলেন–

إِنِّيْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرٰى ○

(سورة الصافات : ١٠٢)

পুত্র আমার! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন বলো তোমার মত কি?

ইবরাহীম (আ.) নিজ সন্তানের মতামত এজন্য চাননি যে, সম্মতি পেলে জবাই করবেন আর না পেলে ফিরে যাবেন। বরং তিনি রায় চেয়েছেন সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু সন্তান তো ইবরাহীম (আ.)-এর। এ তো এমন এক সন্তান, যাঁর বংশধারা থেকেই তাশরীফ আনবেন সকল রাসূলের সরদার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। এজন্যই সন্তানও পাল্টা প্রশ্ন করেন নি যে, আব্বাজান! আমার কী অপরাধ? কী কারণে আমাকে মৃত্যুপথের যাত্রী বানানো হচ্ছে? এর রহস্য কী? কোন হেকমত এতে লুকায়িত? বরং তিনি উত্তর দিলেন–

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ○

(سورة الصافات : ١٠٢)

আব্বাজান! আপনি যা আদেশ পেয়েছেন, তা-ই করে ফেলুন। আল্লাহ্ চাহেন তো আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন। আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি কান্নাকাটি করবো না। আপনার কাজে বাধা দেবো না। আপনি নির্দ্বিধায় কাজ সম্পন্ন করুন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও এ জাতীয় প্রশ্ন আল্লাহ তা'আলাকে করেন নি যে, হে আল্লাহ! আমার আদরের সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ আপনি কেন দিচ্ছেন? এর মধ্যে কী হেকমত লুকায়িত? বরং উভয়ে বিনাবাক্যে আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। তারা ভাবলেন, আমাদের স্রষ্টা ও মালিক যিনি, তাঁরই এ নির্দেশ। তাই তাঁরা নির্দেশটি পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

উদ্যত ছুরি যেন থমকে না যায়

কুরআন মজীদে এ ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত মহব্বতমাখা ভঙ্গিতে। অর্থাৎ– পিতা-পুত্র যখন আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন, এজন্য হাতে ছুরি নিলেন আর সন্তানকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, সন্তানের গলায় এখুনি ছুরি চালানো হবে এবং আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটে যাবে। এ ঘটনাকে উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন মজীদ যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তা দেখুন–

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ○ (سورة الصافات : ١٠٣)

অর্থাৎ পিতা-পুত্র উভয়েই যখন 'ইসলাম' গ্রহণ করে নিলো, উভয় যখন আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদেরকে পেশ করে দিলো, পিতা যখন পুত্রকে উল্টো করে শুইয়ে দিলো। এরূপ করলো কেন? এর কারণ হলো, যেন পিতা পুত্রের চেহারা দেখে হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ না পায় এবং এজন্য যেন আল্লাহর বিধানের সামনে বাধা সৃষ্টি না হয়, তাই এমনটি করা হয়েছিলো। এরূপ স্থলে আল্লাহ তা'আলা أَسْلَمَا শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ উভয়ে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা পেতে দাও

প্রতীয়মান হলো, ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে বরং নিজের গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহর বিধানের সামনে পেশ করে দেয়া। আল্লাহর বিধানের

সামনে বুদ্ধি ও যুক্তির ঘোড়া চালানোর নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহর বিধান সামনে এলে তা মেনে নেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো।

অন্যথায় বুদ্ধির গোলাম হয়ে যাবে

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর নির্দেশ কোনো আপত্তি ছাড়া মেনে নিতে হবে কেন? এর উত্তর হলো, আল্লাহর নির্দেশ এভাবে মেনে না নিলে তখন সেক্ষেত্রে মানুষ বুদ্ধির পেছনে দৌড়াবে। প্রতিটি আসমানী বিধানের পেছনে তখন যুক্তি খুঁজে বেড়াবে। পরিণতিতে আল্লাহর গোলাম না হয়ে তখন বুদ্ধির গোলাম হয়ে যাবে।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ দুনিয়াতে জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু মাধ্যম দান করেছেন। যেমন প্রথম মাধ্যম হলো চোখ। চোখের মাধ্যমে মানুষ দেখে এবং বস্তুর পরিচয় লাভ করে। দ্বিতীয় মাধ্যম হলো জিহ্বা। জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ আস্বাদন করে অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায়। তৃতীয় মাধ্যম হলো কান। কান দ্বারা শুনে অনেক কিছুর জ্ঞানার্জন হয়। চতুর্থ মাধ্যম হলো হাত। হাত দ্বারা স্পর্শ করে বহু কিছু অনুভব করা যায়। পঞ্চম মাধ্যম হলো নাসিকা। নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ শুঁকে অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমার সামনের এ মাইক্রোফোনের কথাই বলছি। চোখে দেখে বলে দিতে পারি, এটি গোলাকৃতির একটি যন্ত্র। কানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এটি শব্দবাহী একটি যন্ত্র। দেখুন, কিছু জ্ঞান অর্জিত হলো চোখ দ্বারা দেখে, কিছু জ্ঞান কান দ্বারা শুনে এবং কিছু জ্ঞান হাত দ্বারা স্পর্শ করে।

এসব মাধ্যমের ক্ষমতা খুবই সীমিত

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত মাধ্যমগুলো দ্বারা জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলোর ক্ষমতা নির্দিষ্ট একটি গণ্ডির ভেতরে সীমিত করে দিয়েছেন, যে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে এ মাধ্যমগুলো দ্বারা জ্ঞানার্জন করা যাবে। কেউ যদি এগুলোকে আপন সীমানার বাইরে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে এগুলো অবশ্যই ভুল করবে। যেমন চোখের একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। চোখ যা দেখে, শুধু সে সম্পর্কেই মানুষকে জ্ঞান দান করে। কিন্তু শোনা বিষয়ে চোখ কোনো জ্ঞান দান

করতে পারে না। কারণ, চোখের শোনার ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতাটা কানের। কান শুনতে পায়; কিন্তু দেখতে পায় না। জিহ্বা দ্বারা স্বাদ নেয়; কিন্তু সে দেখতে পারে না, শুনতেও পারে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি চায় আমি চোখ বন্ধ রাখবো আর কান দ্বারা দেখবো, তাহলে অবশ্যই সে একজন নির্বোধ হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কারণ, এটা কানের কাজ নয় বরং চোখের কাজ। কানের কাজ হলো শুধু শোনা। সে এখানে কানকে তার ক্ষমতার বাইরে ব্যবহার করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি কানকে বন্ধ রাখবো। এখন থেকে শুনবো চোখের মাধ্যমে। আমার সামনে উপবিষ্ট লোকটির কথাগুলো আমি শুনবো চোখের মাধ্যমে। তাহলে এ ব্যক্তিও নির্বোধ হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, চোখ তো শোনার জন্য নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই চোখ অর্থহীন এবং এর অর্থ হলো চোখ ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ করতে সক্ষম, যতক্ষণ তাকে তার সুনির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে ব্যবহার করা হবে। তাকে যদি দেখার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে অবশ্যই তার কাজ করবে এবং দর্শনীয় বস্তুর জ্ঞান দান করবে। কিন্তু যদি শোনার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে কোনো কাজ করতে পারবে না।

জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম বুদ্ধি

কখনও-কখনও এমন একটা সময়ও আসে, যখন এই পঞ্চেন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে পারে না। এগুলো তখন কোনো কাজ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন। তাহলো আকল বা বুদ্ধি-বিবেক। বুদ্ধি-বিবেক মানুষকে এমনসব বিষয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, যা মানুষ চোখে দেখে অর্জন করতে পারে না। যেমন এই মাইক্রোফোন। হাতের দ্বারা স্পর্শ করে এবং চোখের দ্বারা দেখে এতটুকু অবশ্যই বলতে পারবো যে, এটা লোহাজাত একটি কঠিন পদার্থ। কিন্তু এটি কে তৈরি করেছে, কিভাবে এর অস্তিত্ব ঘটলো, এ তথ্য চোখও জানাতে পারবে না। কানও জানাতে পারবে না, জবানও জানাতে পারবে না। এ তথ্য জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন বুদ্ধি বা বিবেক। বিবেকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এ সুন্দর যন্ত্রটি, যা অনেক কাজে আসে, আমাদের আওয়াজকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, এটি আপনা-আপনি সৃষ্ট হয়নি। যে বানিয়েছে সে নিশ্চয় একজন দক্ষ কারিগর। সুতরাং যেখানে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পঞ্চেন্দ্রিয় থমকে যায়, সেখানে আমাদেরকে সহযোগিতা দেয় আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব দান আকল বা বুদ্ধি-বিবেক।

বিবেক-বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র

কিন্তু যেমনিভাবে এ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মপরিসর অসীম নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে তার ক্ষমতা অকেজো হয়ে যায়, তেমনি এ বিবেক-বুদ্ধির ও কর্মপরিসর অসীম নয়। বিবেক-বুদ্ধিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মানুষের উপকার করে তাকে পথপ্রদর্শন করে। কর্মসীমার বাইরে যদি বুদ্ধিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে সে আর সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না। সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে সে অক্ষম হয়ে পড়বে।

জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম হলো ইল্‌মে অহী

বিবেক-বুদ্ধির কার্যক্ষমতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন। আর তাহলো, ইল্‌মে অহী। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহীর জ্ঞান বা আসমানী শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা এ অহীর জ্ঞান নবীগণের উপর নাযিল করেন। অহীর জ্ঞান তথা আসমানী শিক্ষার শুরুই সেখান থেকে, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোনো কাজ হয় না। সুতরাং যেসব বিষয়ের সমাধান বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা করা যায় না, সেসব বিষয়ে পথপ্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আসমানী শিক্ষা দান করেছেন। অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং সেটা আদায় করবো কিভাবে?

বিবেক-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে ইল্‌মে অহী

যেমন এ পৃথিবী ও তার সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এবং মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর সে আরেকটি নতুন জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। সে জীবনে গিয়ে তাকে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। এ দুনিয়াতে কৃত সকল আমলের হিসাব দিতে হবে। সেখানে একটি জগত আছে, যার নাম জান্নাত। জাহান্নাম নামেও আরেকটি জগত আছে। আর এ বিষয়গুলো হলো এমন, যদি আল্লাহ তা'আলা অহী না পাঠাতেন এবং অহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে এসব তথ্য না দিতেন, তাহলে শুধু বুদ্ধি-বিবেকের উপর ভরসা করে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। বুদ্ধি খাটিয়ে কখনও আখেরাতের রহস্য উদঘাটন করতে পারতাম না। জানতে পারতাম না সেখানে আমাদেরকে কেমন অবস্থার মুখোমুখী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সামনে কিভাবে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। অথচ আমাদের জীবনে এ এক নির্ঘাত বাস্তবতা। বরং এটাই তো আমাদের জীবনের প্রধান। আর মঞ্জিলে

মাকসুদ সম্পর্কে জানার জন্যই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানার্জনের এ তৃতীয় মাধ্যম দান করেছেন, যার নাম ইল্‌মে অহী তথা আসমানী শিক্ষা।

অহীকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে মেপো না

বুদ্ধির ক্ষমতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, সেখান থেকে শুরু অহীর শিক্ষার। সেখানে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি দিক-নির্দেশনা দিতে পারে না, সেখানেই অহীর শিক্ষা মানুষকে দিক-নির্দেশনা দেয়। সুতরাং কেউ যদি বলে, অহীর কথা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না তা আমার বুদ্ধির অনুকূলে হবে, তাহলে এ ব্যক্তি ঠিক ঐ ব্যক্তির মতই নির্বোধ, যে বলে, এ বিষয়টি আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমার কান দ্বারা অবলোকন না করবো। বলুন, কান দ্বারা কি অবলোকন করা যায়? তাহলে এ ব্যক্তি নির্ঘাত নির্বোধ। সুতরাং যে ব্যক্তি অহীর কথাকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা মাপতে চায়, সে ব্যক্তিও নির্বোধ। কারণ, অহীর যাত্রা তো সেখান থেকে শুরু, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন আমি আপনাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের উপমা দিলাম। এখন যদি কেউ বলে, জান্নাত-জাহান্নাম আবার কী? এটা যুক্তিবহির্ভূত বিষয়। সুতরাং মানবো কিভাবে? তাহলে বুঝে নিতে হবে এ ব্যক্তি নির্বোধ। কারণ, জান্নাত-জাহান্নাম তো যুক্তি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। যুক্তি-বুদ্ধির আওতায় এগুলোকে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, বুদ্ধি-বিবেকেরও একটা নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে। সে একারণেই জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি অহী পাঠিয়েছেন।

ভালো-মন্দের ফয়সালা করবে ইল্‌মে অহী

অনুরূপভাবে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোন কাজটি নন্দিত আর কোন কাজটি নিন্দিত, কোন বস্তুটি হালাল আর কোন বস্তুটি হারাম, কোন বিষয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আর কোন বিষয়টি অপছন্দনীয় এসব প্রশ্নের সমাধানও ইলমে অহীর উপর নির্ভরশীল। এগুলোর ফয়সালা ইল্‌মে অহীর মাধ্যমেই হবে। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে এসবের ফয়সালা চাওয়া হয়নি। বরং এর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ইল্‌মে অহী বা আসমানী শিক্ষা।

মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ভুল পথ দেখায়

এ পৃথিবীতে যত মন্দ বিষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং যত মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ বিস্তার লাভ করেছে, এগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে মানুষের

বুদ্ধি-বিবেক। বুদ্ধির উপর ভর করেই এগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ধরুন, আমরা মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করি শূকরের গোশত হারাম। এখন যদি এ ক্ষেত্রে অহীর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে শুধু বুদ্ধি-যুক্তির কাছে এর সিদ্ধান্ত কামনা করি, তাহলে বুদ্ধি-যুক্তি আমাদেরকে ভুল সিদ্ধান্ত দিবে নিঃসন্দেহে। আর অমুসলিমরা এ বিষয়ে বুদ্ধি-যুক্তির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। তাই তারা বলে, শূকরের গোশত খুবই সুস্বাদু বিধায় আমাদের কাছে খুবই প্রিয়। আরো বলে, শূকরের গোশত খাওয়াতে সমস্যাটা কী? এর মধ্যে এমন কী যৌক্তিক অসুবিধা আছে? অনুরূপভাবে আমরা বিশ্বাস করি, মদ হারাম। মদ একটি খারাপ বস্তু। কিন্তু যে ব্যক্তি অহীর সিদ্ধান্ত মানে না, তার বক্তব্য হলো, মদ এমন কী দোষের বিষয়? আমরা তো এর মাঝে খারাপ কিছু দেখছি না। বিশ্বের মাঝে লক্ষ-লক্ষ মানুষ মদ পান করছে। কই তাদেরকে তো তেমন কোনো ক্ষতির শিকার হতে দেখি না। তাছাড়া এটা বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আমাদের বুদ্ধি-যুক্তির বিচারে এতে দোষের কিছু দেখছি না। অনেকে তো আরো বলে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাতে এমন কী সমস্যা আছে? যদি একজন পুরুষ একজন নারীকে সমঝোতার মাধ্যমে ভোগ করে, তাহলে যৌক্তিক বিচারে কোনো সমস্যা তো দেখা যায় না। বুদ্ধির বিচারে এ কে তো খারাপ বলা যায় না। যখন তারা পারস্পরিক সম্মতিতে যৌনসুখ ভোগ করছে, তখন তৃতীয়জন বাধা হয়ে দাঁড়াবার তো কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সারকথা হলো, যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, এ জাতীয় আরো বহু অন্যায় অপকর্ম এ পৃথিবীতে বৈধভাবে সার্টিফিকেট পেয়েছে এ বুদ্ধি ও যুক্তির উপর ভর করেই। এর একমাত্র কারণ হলো, বুদ্ধি-বিবেককে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে, যেখানে তার কার্যক্ষমতা নেই। যেখানে প্রয়োজন অহীর শিক্ষা ও তার দিক-নির্দেশনা। সুতরাং যেসব বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অহী পাঠিয়েছেন, সেসব বিষয়ে যদি মানুষ বুদ্ধি-বিবেকের কাছে ফয়সালা জানতে চায়, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না এবং বিভ্রান্তিই ছড়াবে।

কমিউনিজমের ভিত্তি ছিলো বুদ্ধি

দেখুন, প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলো কমিউনিউজম বা সোস্যালিজম। যে মতবাদটি মানবীয় বুদ্ধিরই একটি প্রসব। সাম্য ও অসহায়দের প্রতি সম্প্রীতির স্লোগান দিয়ে সে গোটা বিশ্বকে প্রকম্পিত

করে তুলেছিলো। পৃথিবীর চারিদিকে তখন শুধু কমিউনিজমেরই জয়গান শোনা যেতো। এমনও বলতে শোনা গেছে, অনতিবিলম্বে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজমের শাসন। দেখা গেছে, কেউ যদি সাহস করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতো, কেউ যদি তাদের এ ভুল চিন্তাধারার প্রতি আঙ্গুল তুলতো, তখন তাকে বলা হতো পুঁজিবাদের এজেন্ট। তাকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা হতো। বলা হতো সেকেলে। কিন্তু চুয়াত্তর বছর পর আজকের পৃথিবী দেখছে, যে লেনিনের পূঁজা করা হতো, তার ভক্ত-অনুসারীরাই তার মূর্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিচ্ছে। মূলত অহীর শিক্ষা থেকে মুক্ত শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল মতবাদের পরিণতি এমনই হয়। হঠাৎ করে যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক, পরিণতি হয় খুবই করুণ ও ভয়াবহ।

অহীয়ে এলাহীর সামনে মাথা পেতে দাও

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যদি জীবনটাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে চালাতে চাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত বিধান যখনই তোমার সামনে আসবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে। অহীয়ে এলাহীর সামনে মাথা নুইয়ে দিবে। এর বিপরীতে বুদ্ধি কিংবা যুক্তির ঘোড়া দাবড়ানোর চেষ্টা করবে না। দৃশ্যত যদিও সেটা বুদ্ধি ও যুক্তি পরিপন্থী হয় এবং স্বার্থবিরোধী হয়, তবুও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষাকেই মেনে নিবে। এতে কোনো প্রকার বাক্যব্যয়ের চেষ্টা চালাবে না। এভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাকেই বলা হয় ইসলামে প্রবেশ করা। আমার আজকের তেলাওয়াতকৃত আয়াতের এটাই মর্মার্থ। আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুগত হয়ে যাও।'

ইসলামের পাঁচটি অংশ

ইসলামের পাঁচটি অংশ রয়েছে। এ পাঁচটি অংশ মিলেই ইসলাম। যথা–

১. আকাইদ : আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হওয়া।

২. ইবাদাত : যথা– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা।

৩. মু'আমালাত : যথা– বেচাকেনা, লেনদেন ইত্যকার ক্ষেত্রে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের বিধান মেনে চলা।

৪. মু'আশারাত : যথা– পরস্পর আচার-আচরণ, ওঠা-বসা ও অন্যান্য জীবনাচারে আল্লাহর বিধান মেনে চলা।

৫. আখলাক : আধ্যাত্মিক গুণাবলী, আবেগ-উদ্দীপনা ও চিন্তাধারা বিশুদ্ধ হওয়া।

প্রকৃত মুসলমান হতে হলে ইসলামের উক্ত পাঁচটি অংশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে হবে। আজ আমরা সকলেই মসজিদে মুসলমান। অথচ বাজারে গেলে মানুষকে ধোঁকা দিই। আমানতে দুর্নীতি করি। অন্যকে কষ্ট দিই। কারণ, আসলে আমরা মুসলিম হলেও ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করিনি। ইসলামের এক চতুর্থাংশ হলো ইবাদত। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ হলো মানুষের অধিকার। যতক্ষণ না এসব বিষয়ে সচেতন ও যত্নবান হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামে মুসলমান হলেও পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত উমর (রা.) সফরে বের হয়েছিলেন। পরনে সাদাসিধে কাপড়। পথ চলতে-চলতে কোথাও ক্ষুধা লেগে গেলো। ক্ষুধার জ্বালায় যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলেন, তখন দেখলেন পথের ধারে একটি ছাগলের পাল। ভাবলেন, এ ছাগলের মালিকের কাছে যদি এক পেয়ালা দুধ পাই, তাহলে ক্ষুধাটা নেভাতে পারবো। এগিয়ে গেলেন ছাগলের পালের দিকে। পাহারাদারকে বললেন, ভাই! আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে এক পেয়ালা দুধ দাও। পয়সা যা চাও তা-ই দিবো।

ছাগলের রাখাল বললো, জনাব! আমি আপনাকে দুধ অবশ্যই দিতাম। কিন্তু এ ছাগলগুলোর মালিক আমি নই। আমার হাতে এগুলো আমানত। এগুলোর মালিক আমাকে কাউকে দুধ দেয়ার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং আমি আপনাকে কিভাবে দুধ দেবো? হযরত উমর রাযি. শাসক ছিলেন আবার শিক্ষকও ছিলেন। তিনি যখন পথে বের হতেন, তখন তাঁর প্রজাদেরকে মাপ-ঝোপও করতেন। ভাবলেন, এ রাখাল ছেলেটিকেও একটু মেপে নিই। তাই তিনি পরীক্ষা করার মানসেই বললেন, বৎস! আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি মান তোমারও লাভ হবে আমারও ফায়দা হবে।

রাখাল বললো, কী সেই প্রস্তাব?

উমর (রা.) বললেন, তুমি আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে তার মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি। ছাগলটি আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো। তার দুধ পান করবো। প্রয়োজনে জবাই করে গোশতও খেতে পারি।

আর তুমি তার মূল্য পেয়ে যাবে। মালিক এসে যদি তোমাকে ছাগলটির কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলে দিবে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে। ব্যস! তোমারও লাভ হলো, আমিও উপকৃত হলাম। তুমি টাকা পেলে আমি ছাগল পেলাম।

উমর (রা.)-এর প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল এ বলে চিৎকার করে উঠলো–

يَاهٰذَا فَاَيْنَ اللهُ !

জনাব! তাহলে আল্লাহ কোথায়?

হযরত উমর (রা.) মূলত ছেলেটিকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরীক্ষায় যখন ছেলেটি উতরে গেলো, তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন এ উম্মতের মাঝে বেঁচে থাকবে, ততদিন তারা কল্যাণ ও সফলতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় ও পরকালের চিন্তা জাগরুক থাকে, পরকালের জবাবদিহিতার উপলব্ধি থাকে, তখন তার পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব হয় না। একেই বলে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা। যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামের এ পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে যায়, তখন নির্জন প্রান্তরেও এই ভেবে অপরাধ থেকে বিরত থাকে যে, আমাকে তো আমার প্রভু দেখছেন। এটা ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ছাড়া কোনো মুসলমান প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ –

যার অন্তরে আমানত নেই, তার অন্তরে ঈমানও নেই।

এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা

খাইবার যুদ্ধ চলছে। এক রাখাল এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দাঁড়ালো। সে ইহুদীদের ছাগল চরাতো। সে যখন লক্ষ্য করলো, খাইবারের বাইরে মুসলমানগণ ছাউনি ফেলেছে, তখন সে মনে-মনে বললো, মুসলমানদের কাছে একটু গিয়ে দেখি। দেখি তারা কী বলে, কী করে? তারপর সে ছাগল চরাতে-চরাতে মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো। জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নেতা কে? মুসলমানরা উত্তর দিলো, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি তাঁবুর ভেতরেই আছেন। প্রথমে সে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছে, এত বড় একজন নেতা, এ সামান্য তাঁবুর ভেতরে কিভাবে থাকবেন? এ তাঁবুর ভেতরে তো সামান্য খেজুর পাতার ছাটাই বিছানো। অবশেষে সে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলো

এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। জানতে চাইলো, আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে আমার পরিণতি কী হবে? এর বিনিময়ে আমি কী পাবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি আমার ভাই হয়ে যাবে। আমরা তোমাকে বুকে নিয়ে নেবো।

একথা শোনার পর রাখাল বললো, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন! আপনি কোথায় আর আমি কোথায়! আমি একে তো সামান্য রাখাল, তার উপর কালো। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করবো। আল্লাহ তোমার কালো মুখকে উজ্জ্বল করে দিবেন। তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুগন্ধ করে দিবেন।

একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে মুসলমান হয়ে গেলো এবং কালিমা পাঠ করলো। তারপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমি কী করবো?

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দেখো, তুমি এমন সময় মুসলমান হয়েছো, তখন নামাযের সময় নয়, রোযার মাসও নয়। তোমার উপর যাকাতও ফরয নয়। সুতরাং এখন তোমাকে এগুলো বলছি না। এখন একটা ইবাদত আছে, যা তরবারির ছায়াতলে পালন করা যায়। আর তাহলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

একথা শোনার পর রাখাল বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ জিহাদে অংশগ্রহণ করছি। হয় গাজী হবো, না হয় শহীদ হবো। যদি শাহাদতবরণ করি, তাহলে আপনি আমার জামিন হোন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে তোমার জামিন হচ্ছি যে, যদি তুমি এ জিহাদে শহীদ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন। তোমার শরীরের দুর্গন্ধ সুগন্ধিতে পরিণত করে দিবেন। তোমার কৃষ্ণ অবয়বকে শুভ্র ও সুন্দর করে দিবেন ।

ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আস

যেহেতু সে ছিলো ইহুদীর রাখাল, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি ইহুদীদের যে ছাগলগুলো নিয়ে এসেছো, সেগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আস। কারণ, এগুলো তোমার হাতে তাদের আমানত।

লক্ষ্য করুন, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, যাদের কেল্লা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, যাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে মুসলমানরা পাবে, তাদের

সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কারণ, এ ছাগলগুলোর মালিকের সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো যে, সে এগুলো চরাবে। তার হাতে এগুলো আমানত হিসাবে থাকবে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আগে ছাগলগুলো ফেরত দিয়ে এসো। এসে জিহাদে অংশ নিলো এবং শাহাদত বরণ করলো। একেই বলে ইসলাম।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোপন কথা জানতেন। তাঁর ঘটনা বলছি। হযরত হুযাইফা (রা.) ও তাঁর পিতা ইয়ামান (রা.) মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেতমতে মদীনা যাচ্ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের ঘোর দুশমন আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে দলবলসহ মদীনায় যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে আবু জাহলের সঙ্গে হুযাইফা (রা.)-এর দেখা হয়ে গেলো। আবু জাহল তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো? তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর খেদমতে মদীনা যাচ্ছি। আবু জাহল একথা শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললো, তাহলে তো তোমাদেরকে ছাড়া যাবে না। কারণ, তোমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিবে। তাঁরা বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে শুধু সাক্ষাত করবো। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবো না। আবু জাহল বললো, তাহলে আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে সেখানে গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে শুধু সাক্ষাত করবে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তাঁরা আবু জাহলের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। আবু জাহল তাদেরকে ছেড়ে দিলো। যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পৌছলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বদর অভিমুখে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পথে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো।

বদর যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার প্রথম লড়াই

একটু ভেবে দেখুন, হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই, ইসলামের প্রথম জিহাদ, যা প্রায় আসন্ন, যা এমন এক যুদ্ধ যে, কুরআন একে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' তথা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যের দিন হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে যাচ্ছেন। তাঁরা বদরী সাহাবী হিসাবে আখ্যায়িত হতে যাচ্ছেন। বদরী

সাহাবীদের নাম অযীফা হিসাবেও পাঠ করা হয়। এদের নামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করেন। এদের সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সেই জিহাদ সংঘটিত হচ্ছে। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হযরত হুযাইফা (রা.) প্রথমে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরলেন। তারপর তারা দরখাস্ত পেশ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বদর যুদ্ধে যাচ্ছেন, আমাদের ইচ্ছা আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার। আর আবু জাহলের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা তো সে গর্দানের উপর তরবারি রেখে আমার কাছ থেকে আদায় করেছে। তখন যদি আমরা তার কথায় অসম্মতি প্রকাশ করতাম আর অঙ্গীকারাবদ্ধ না হতাম, সে আমাদেরকে আটকে রাখতো। সুতরাং ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের এই প্রথম জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে আমরাও এর ফযীলত লাভে ধন্য হতে পারি। [আল-ইসাবাহ খণ্ড : ১, ২, পৃষ্ঠা : ৩১৬]

তোমরা তো অঙ্গীকার করে এসেছো

কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কথা দিয়ে এসেছো এবং তোমাদেরকে তারা এ শর্তে মুক্তি দিয়েছে যে, তোমরা এখানে এসে শুধু সাক্ষাত করবে। তোমাদের নবীর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। সুতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া যাবে না।

এটাই মানবজীবনের এক কঠিনতম পরীক্ষার মুহূর্ত। একজন মানুষ তার ওয়াদার প্রতি কতটুকু যত্নবান, তার পরীক্ষা এ জাতীয় মুহূর্তেই হয়ে থাকে। আমাদের মত দুর্বল ঈমানদার হলে কত বাহানা খুঁজে বের করতাম। হয়তো বলতো, তাদের সাথে কৃত ওয়াদা খাঁটি দিলে করিনি। তারা তো আমাদের থেকে জোরপূর্বক ওয়াদা আদায় করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন, এভাবে আরো কত টালবাহানা আমরা পেশ করতাম। হয়ত এ বাহানা বের করতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জিহাদের শরিক হয়ে কুফরের মোকাবেলা করাই ছিলো সময়ের দাবী। কারণ, মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা মাত্র তিন'শ তেরজন, যাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র। সুতরাং এ সময়ে প্রতিটি মানুষের মূল্য অপরিসীম। যাদের নিকট ছিলো মাত্র সত্তরটি উট, দুটি ঘোড়া আর আটটি তরবারি। অবশিষ্টদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ছিলো পাথর ইত্যাদি। মুজাহিদদের এ ক্ষুদ্র বাহিনী মোকাবেলা করতে যাচ্ছিলো এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার। তাই জনশক্তির খুব প্রয়োজন ছিলো। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, কৃত ওয়াদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এর খেলাফ করা যাবে না।

জিহাদের লক্ষ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা

কেননা, এ জিহাদ ছিলো না কোনো রাজ্য বা ক্ষমতা দখলের জন্য। বরং এ জিহাদের লক্ষ্য ছিলো সত্যকে মিথ্যার উপর বিজয়ী হিসাবে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে যদি সেই সত্যকে উপেক্ষা করে জিহাদ করা হয়, গুনাহে লিপ্ত হয়ে যদি দ্বীনের কাজ করা হয়, তাহলে তো তা দ্বীনের কাজ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সকল চেষ্টা ও শ্রম বিফলে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, আমরা চাই ইসলামের প্রচার ও প্রসার। আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এরজন্য প্রয়োজনে গুনাহ করি, হারাম কাজও করি। আর সব সময় আমাদের মাথায় বাহানা ঘুরতে থাকে। অনেক সময় বলে থাকি, এখন যুগের দাবী মতে চলাটাই দ্বীনের জন্য কল্যাণকর। হেকমতের দোহাই দেই, ইসলামের স্বার্থের বাহানা তুলে আমরা ইসলামের অকাট্য বিধানকে পাশ কাটিয়ে যাই। এগুলো শুধুই আমাদের বাহানা।

একেই বলে ওয়াদা পূর্ণ করা

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের তো একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিংবা গনীমত অর্জন করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। আর ইসলামের বিধান হলো, কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে হয়। এতেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হুযাইফা ও পিতা ইয়ামান (রা.) কে বদরের মত মহান ফযীলতপূর্ণ যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখলেন। কারণ, তাঁরা ওয়াদা করে এসেছে জিহাদে শরিক হবে না। একেই বলে ওয়াদা পূর্ণ করা। আর এটাই ইসলামের রূপ। আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা

আধুনিক বিশ্বে এমন বিরল ঘটনা খুঁজে পাওয়া না গেলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গোলামদের মাঝে এর দৃষ্টান্ত বিপুল। যেমন ধরুন, মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা। কিছু লোক অজ্ঞতাবশত এ মহান সাহাবীর শানে সমালোচনা করে থাকে। তাঁর শানে বেয়াদবি করে নিজেদের আখেরাতকে বরবাদ করে থাকে। অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্পর্কে এ সাহাবীর একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনুন।

যুদ্ধের কৌশল

হযরত মু'আবিয়া (রা.) বাস করতেন সিরিয়ায়। তাই সমকালীন পরাশক্তি রোমানদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লেগেই থাকতো। একবার তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করলেন। একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করবো না। যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে মু'আবিয়া (রা.) ভাবলেন, মেয়াদ তো যথাস্থানে ঠিকই আছে। এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি আমি আমার সেনাবাহিনী রোমান সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি হটাৎ আক্রমণ চালাবো। এর ফলে শত্রুপক্ষ প্রস্তুতি নেয়ার সময়ের প্রয়োজন হবে। ফলে হটাৎ হামলা করে আমরা সহজেই বিজয় লাভ করতে পারি।

এটাও চুক্তিভঙ্গ

এ ভেবে তিনি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। তারপর মেয়াদ শেষের শেষ দিনটির সূর্য যখনই অস্ত গেলো, সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে বাহিনীকে শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মু'আবিয়া (রা.)-এর এ কৌশল খুবই সফল প্রমাণিত হলো। কারণ, শত্রুপক্ষ এ আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। ফলে মু'আবিয়া (রা.) -এর বাহিনী শহরের পর শহর গ্রামের পর গ্রাম বিনা বাধায় জয় করে ফেললো। তাঁরা বিজয়ের নেশায় প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এরই মধ্যে মু'আবিয়া (রা.) লক্ষ্য করলেন, পেছনের দিক থেকে ঝড়বেগে একটি ঘোড়া এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটিকে এদিকে আসতে দেখে তিনি বাহিনীর গতি থামিয়ে দিলেন। ভাবলেন, ঘোড়সওয়ার হয়তো আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নতুন কোনো পয়গাম নিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার নিকটে আসতেই চিৎকার করে বলতে লাগলো–

الله اَكْبَرُ قِفُوْا عِبَادَالله قِفُوْا عِبَادَالله –

আল্লাহু আকবার! থামো আল্লাহর বান্দারা। থামো আল্লাহর বান্দারা ।

ঘোড়সওয়ার যখন আরো নিকটবর্তী হলো, মু'আবিয়া (রা.) তাঁকে চিনে ফেললেন। এ তো দেখি আমর ইবনে আবাসা। মু'আবিয়া (রা.) বিস্মিত কণ্ঠে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার আমর! আমর (রা.) উত্তর দিলেন–

وَفَاءٌلاَ غَدَرٌ وَفَاءٌلاَ غَدَرٌ –

(মুমিনের বৈশিষ্ট্য ওয়াদা পূর্ণ করা; গাদ্দারী করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।)

মু'আবিয়া (রা.) উত্তরে বললেন, এখানে গাদ্দারীর কী আছে? আমি তো তখনই হামলা করেছি, যখন চুক্তির শেষ দিনটিও গত হয়েছে।

আমর ইবনে আবাসা বললেন, এখন যদিও চুক্তির শেষ সীমাও গত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আপনি তো চুক্তির সময়ের ভেতরেই মুজাহিদ বাহিনী শত্রুসীমান্তে নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া চুক্তির সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি দল সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছে। এটা তো সন্ধি ভঙ্গের শামিল। কারণ, আমি নিজকানে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি–

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّهُ وَلاَ يَشُدَّنَّهُ اِلٰى اَنْ يَمْضِىَ اَجَلٌ لَهُ اَوْيَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ –

(ترمذی ، ابوابِ السير ، باب فی الغدر، حديث نمبر : ١٥٨٠)

অর্থাৎ– যখন কোনো জাতির সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ না হবে কিংবা প্রতিপক্ষের সামনে চুক্তি সমাপ্তির প্রকাশ্য ঘোষণা না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চুক্তিবিরোধী কোনো আচরণ করবে না। বলুন, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিংবা চুক্তি সমাপ্তির প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া ছাড়াই শত্রুপক্ষের সীমানায় তাঁবু ফেলা কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ হাদীসের আলোকে বৈধ হলো?

বিজিত এলাকা ফেরত দিলেন

একবার ভেবে দেখুন, একটি বিজয়ী বাহিনী। যারা একের পর এক শত্রু এলাকা পদানত করে এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রুদলের বিশাল এলাকা যারা দখল করে নিয়েছে। যারা বিজয়ে নেশায় মত্ত। তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ প্রাণপ্রিয় সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর কানে যখন প্রিয়তম রাসূলের এ বাণীটি পড়লো যে, অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তখনই তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যতখানি এলাকা জয় করা হয়েছে, সবটা ফিরিয়ে দাও। সত্যিই-সত্যিই তাঁরা ফেরত দিয়ে দিলেন সব বিজিত এলাকা। বলুন, চুক্তির মর্যাদা দেয়ার এমন বিরল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো জাতি পেশ করতে পারবে কি? মুসলমানগণ এ বিশাল বিজিত অঞ্চল শুধু এ কারণেই ফেতর দিয়েছিলেন, যেহেতু তাদের দৃষ্টি কোনো ভূখণ্ডের প্রতি ছিলো

না, রাজত্ব কিংবা নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও তাদের লক্ষ্য ছিলো না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই তাঁরা যখনই জানতে পেরেছেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অবৈধ আর এখানে পুরোমাত্রায় অঙ্গীকার করা না হলেও সম্ভাবনা তো আছে। তাই তারা বিজিত এলাকা ছেড়ে পেছনে চলে এলেন। একেই বলে ইসলাম। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

অঙ্গীকার পূরণে হযরত উমর (রা.)

হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করলেন, তখন সেখানকার ইহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি হয়েছিলো যে, আমরা তোমাদের জান ও মালের হেফাজত করবো। এর বিনিময়ে আমাদেরকে জিযিয়া দিবে। জিযিয়া মানে অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত ট্যাক্স। চুক্তিমাফিক তারা প্রতি বছর জিযিয়া আদায় করতে লাগলো। এরই মধ্যে একবার মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলিমদের লড়াই শুরু হলো অন্য অঞ্চলে। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে এই অঞ্চলে পাঠানোর পরামর্শ এক মুসলমানের পক্ষ থেকে এলো। হযরত উমর (রা.)-এর কাছে প্রস্তাবটি বেশ মনঃপুত হলো। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের প্ররিতরক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে ফিরিয়ে এনে এই অঞ্চলে পাঠানো হোক। তবে সাথে-সাথে এ নির্দেশও দিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাসরত সকল ইহুদী-খ্রিস্টানকে সমবেত করে বলে দাও, আমরা তোমাদের জানমালের নিরাপত্তার জিম্মাদারি নিয়েছিলাম। এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে জিযিয়া নিয়ে আসছিলাম। এ উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সৈন্যও নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু এখন এসব সৈন্যকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সুতরাং এ বছর তোমরা আমাদেরকে যে জিযিয়া দিয়েছিলে, তা তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আর এজন্যই আমরা এখন থেকে তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি না। এখন তোমরাই তোমাদের জানমালের হেফাজত করবে।

এরই নাম ইসলাম। শুধু নামায, রোযা আর হজ্ব করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। বরং নিজের সর্বস্ব-জিহ্বা, চোখ, নাক, কানসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমতো চলার নামই ইসলাম।

কাউকে কষ্ট দেয়া ইসলাম পরিপন্থী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান তো সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ। মদপান করা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, শূকরের গোশত খাওয়া যেমন কবীরা গুনাহ, কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়াও অনুরূপ কবীরা গুনাহ। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে কাউকেই কষ্ট দিবে না। যেমন আপনি হয়ত গাড়ি নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। এখন পথে যদি গাড়ি পার্কিং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে পার্কিং করুন, যেন কোনো পথিকের কষ্ট না হয়। যদি আপনি কোনো চলার পথে গাড়ি পার্কিং করেন, যার কারণে পথচারীর চলাফেরায় সমস্যা সৃষ্টি হলো। আপনি হয়ত মনে করছেন, এক্ষেত্রে বড়জোর আমি ট্রাফিক আইন লংঘন করেছি। এটাকে আপনি কবীরা গুনাহ মনে করছেন না। অথচ এটা কেবল অন্যায় কাজ নয় বরং জঘন্য কবীরা গুনাহ। মদ খাওয়ার মতই এটি কবীরা গুনাহ। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। আপনি ভুল স্থানে পার্কিং করার অর্থই হলো আপনার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকলো না। আজ আমরা ইসলামকে শুধু ইবাদত-বন্দেগী ও নামায রোযা কিংবা মসজিদের মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেলেছি। মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করাকে ইসলাম মনে করি না। আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের অধিকারকে আমরা ইসলামের বাইরের কিছু মনে করি।

প্রকৃত দরিদ্র কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, বল তো, দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আমরা তো এমন ব্যক্তিকেই দরিদ্র মনে করি, যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই, সে প্রকৃত দরিদ্র নয়। বরং প্রকৃত দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে শূন্য হাতে। অথচ তার আমলনামায় বিপুল পরিমাণে রোযা থাকবে, নামায থাকবে, ওযীফা থাকবে, তাসবীহ থাকবে, নফল ইবাদতও বিপুল পরিমাণে থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাবে, সে কারও সম্পদ মেরে দিয়েছিলো। কাউকে ধোঁকা দিয়েছিলো। কারো মনে কষ্ট দিয়েছিলো। এভাবে সে বহু মানুষের বহু অধিকার নষ্ট করেছে। এখন সেই হকদাররা এসে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। সকলেই আল্লাহর দরবারে নিজ-নিজ অধিকার খর্বিত হওয়ার কথা বলে এর বিচার চাইবে। কিন্তু আখেরাতে তো আর টাকা-পয়সা থাকবে না। ডলার থাকবে না।

থাকবে শুধু নেকী। সুতরাং খর্বিত অধিকারের বিনিময়ে তখন হকদারদেরকে তার আমলনামা থেকে নেকী দেয়া শুরু হবে। কাউকে নামায দিয়ে দেয়া হবে। কাউকে রোযা দেয়া হবে। এভাবে হকদাররা তার অর্জিত নেকীগুলো আপন-আপন হক অনুপাতে তার আমলনামা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আর সে খালি হাত নিয়ে পড়ে থাকবে। নামায, রোযা ইত্যাদির যে বিপুল নেকী নিয়ে এসেছিলো, দেখা যাবে পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে সবই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও পাওনাদার রয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, এদের পাওনা আদায়ের পদ্ধতি হলো পাওনাদারের আমলনামায় রক্ষিত গুনাহগুলো এনে এর আমলনামায় রেখে দাও। এভাবে অবশেষে সে নিজের সব নেকী হারিয়ে উপরন্তু অন্যের গুনাহ মাথায় নিতে বাধ্য হবে। এ হলো আসল দরিদ্র।

আজও আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করিনি

উক্ত হাদীস থেকে অনুমান করুন, বান্দার হক কত কঠিন বিষয়। অথচ আমরা এ বিষয়টিকে ইসলামের বাইরে ছুঁড়ে রেখেছি। কুরআন মজীদের আহ্বান তো ছিলো এই, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। অর্ধেকটা নয়। ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পুরোপুরি। তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের জীবনাচর, তোমাদের ইবাদত, তোমাদের লেনদেন, তোমাদের কৃষ্টিকালচারসহ সকল দিক থেকেই তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি ইসলামের অনুসরণ করতে পার, তবেই প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারবে। মূলত এক সময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। ইসলাম শুধু তাবলীগের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি। ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিলো মুসলমানদের জীবন, তাঁদের অবদান ও আচার-আচরণের মাধ্যমে। মুসলমানরা যেদিকেই গিয়েছেন সমুন্নত চরিত্রের প্রাচুর্যতা দেখিয়েছেন। ফলে লোহা গলে মোম হয়ে গিয়েছে তাঁদেরই পরশে এসে। তাঁদের পরিশীলিত জীবনাচারে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে-ই তাঁদের সংস্পর্শে এসেছে, সে-ই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আর আজ যে-ই আমাদের জীনাচার দেখে, সে-ই আমাদের প্রতি ঘৃণাবোধ করে। আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং আমাদেরকে এখন থেকে অঙ্গীকার করতে হবে, আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করবো। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলবো।

সবশেষে আমি আপনাদের কাছে আরয করতে চাই, প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্য থেকে সামান্য কিছু সময় আমরা ইসলামকে জানার জন্য আলাদা করে নেবো। সে সময়ে ইসলাম বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি পাঠ করবো। বাসা-বাড়িতে দ্বীনী গ্রন্থাবলী তা'লিমের পরিবেশ গড়ে তুলবো। এ সময়ের বড় বিপদ হলো, আমরা মুসলমানরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং আমরা যদি দ্বীন সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করি এবং এ জানার মাধ্যমে যদি মনের ভেতর দ্বীন মানার জায়গা সৃষ্টি হয়, তাহলেই এ বসা ও দ্বীনী কথা শোনা সার্থক হবে।

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

যাকাত কিভাবে আদায় করবেন?

আল্লাহ যদি বলতেন, আমার দেয়া সম্পদ থেকে আমার জন্য খরচ করবে সাড়ে সাতানব্বই ভাগ আর আড়াই ভাগ রাখবে তোমার নিজের জন্য, তাহলে এটা অন্যায় হতো না মোটেও। কেননা, অর্থ-সম্পদ সবই তো তাঁর। তিনিই তো এ গুলোর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি; বরং আমাদের উপর দয়া করেছেন। বলে দিয়েছেন, আমি জানি তোমরা দুর্বল। তোমাদের অর্থ-সম্পদের দরকার। আমি জানি, এ অর্থ সম্পদের প্রতি রয়েছে তোমাদের প্রবল আকর্ষন। তাই সাড়ে সাতানব্বই ভাগই তোমরা রেখে দাও। বাকি আড়াই ভাগ আমাকে দাও। এতে অবশিষ্ট সাড়ে সাতানব্বই ভাগই তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। হবে বরকতপূর্ন।”

যাকাত কিভাবে আদায় করবেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○ (سورة التوبة : ٣٤-٣٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, (এখানে যাকাত অর্থে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেহ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। সে দিন বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করে যাচ্ছিলে, তা আস্বাদান কর। –(সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

মুহতারাম উপস্থিতি!

আজকের সেমিনার আয়োজিত হতে যাচ্ছে ইসালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যাকাতকে কেন্দ্র করে। মাহে রমযান অত্যাসন্ন। মানুষ সাধারণত রমযানেই যাকাতের হিসাব করে। তাই রমযানকে সামনে রেখেই আজকের সেমিনারের আয়োজন। সুতরাং আজকের সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো যাকাতের গুরুত্ব, ফাযায়েল ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা রাখা, যেন এ সম্পর্কে আমরা কিছু ঈমান অর্জন করে আমল করতে পারি।

যাকাত না দেওয়ার পরিণাম

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি কুরআন মাজীদের দুটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, যাকাত না দেয়া শুধু অপরাধই নয়; বরং এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। বলা হয়েছে, যারা নিজেদের সোনা -রুপা জমিয়ে রাখে অথবা যাকাত দেয় না, তাদেরকে আপনি (রাসূল সা.) ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ দিন। তাদের পুঞ্জীভূত এসব সোনাদানা-টাকা-পয়সা অর্থ-সম্পদের যাকাত না দেয়ার কারণে সেগুলো তাদের জন্য রূপান্তরিত হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক উপকরণ হিসাবে। কেয়ামতের দিন এগুলো দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেহ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। আর বলা হবে–

هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

এটাই সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রাখতে। আজ তার মজা বুঝে নাও। যাকাত ছিলো তোমাদের জন্য একটি ফরয বিধান। এ বিধান পালনে তোমাদের গাফলতি আজ আস্বাদন করে নাও। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ○ الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ○ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ○ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ○ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ (سورة الهمزة ١-٧)

অর্থাৎ– প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে অর্থ কুক্ষিগত করে ও গণনা করে (প্রতিদিন গুনে দেখে তার সঞ্চিত অর্থ কত বাড়ল এবং এ থেকে আত্মতৃপ্তি বোধ করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কখনও নয়। মনে রাখবে, তার যত সম্পদ, যা থেকে সে যাকাত দেয় না এবং নিজের উপর আরোপিত হক আদায় করে না এর কারণে সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, হুতামা (পিষ্টকারী) কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন। এটা মানুষের প্রজ্জ্বালিত আগুন নয় যে পানি, মাটি কিংবা ফায়ার বিগ্রেডের সাহায্যে নিভিয়ে দেয়া যায়। এটা আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত খবর নিয়ে ছাড়বে।

যাকাত অনাদায়ী থাকলে আল্লাহ্ এমন কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে এ থেকে হেফাযত করুন।

এ সম্পদ কার?

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এত ভয়াবহ কেন? এর কারণ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি বা কৃষি যে মাধ্যমেই হোক না কেন যেসব সম্পদ আমরা জমাচ্ছি, এগুলো কি আমাদের গায়ের জোরে করছি? এসব তো আল্লাহর দান। তিনি বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো অর্জন করতে পারি। রিযিকের মালিক তো রাযযাক।

গ্রাহক পাঠায় কে?

তোমাদের ধারণা হলো তোমার পুঞ্জীভূত সম্পদ দোকান-পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব তোমার নিজস্ব। এটা দেখলে না, তোমার দোকানে গ্রাহক পাঠালেন কে? যদি এমন হতো যে তুমি দোকান খুলে বসলে; কিন্তু কোনো গ্রাহক এলো না, তাহলে কি তোমার দোকানে বেচা-বিক্রি হতো? আয়-আমদানি কি হতো? সুতরাং কে পাঠাচ্ছেন তোমার দোকানের গ্রাহক? মূলত এটা তো

আল্লাহই করছেন। মানুষ মানুষের জন্য এ নিয়মের ছকে তিনি গোটা বিশ্বব্যবস্থাকে চালাচ্ছেন। একজনের প্রয়োজন হয় অপরজনের কাছে। একজনের প্রয়োজন পূরণ হয় অপরজনের মাধ্যমে। একজনের অন্তরে তিনি দোকান খোলার ইচ্ছা তৈরি করেন। আর অপরজনের অন্তরে ইচ্ছা তৈরি করেন সে দোকান থেকে কেনার।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

আমার বড় ভাই যাকী কাইফী (রহ.)। আল্লাহ তা'আলা তার মাকাম উঁচু করুন। আমীন। লাহোরে তাঁর একটি কুতুবখানা ছিলো। ইদারায়ে ইসলামিয়াত নামক কুতুবখানাটিতে তিনি ইসলামী বইপত্র বিক্রি করতেন। দোকানটি অবশ্য এখনও আছে। একদিন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত ও কুদরতের আজব কারিশমা ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখান। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো। পুরো শহরই ছিলো বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটেও জমে গিয়েছিলো কয়েক ইঞ্চি পানি। আমি ভাবলাম, এ বৃষ্টির মাঝে আজ আর কে বের হবে? রাস্তা-ঘাটের পানি ডিঙিয়ে কে ই-বা আসবে কিতাব কিনতে? তাও আবার ধর্মীয় কিতাব। আজকাল তো মানুষ ধর্মীয় বইপত্র কিনতেই চায় না। দুনিয়ার সব প্রয়োজন পূরা হলে তবে খেয়াল জাগে ধর্মীয় কিতাব কেনার কথা। মানুষ ধর্মীয় বইকে মনে করে ফালতু জিনিস। জানার জন্য কিংবা আমল করার জন্য পড়ে না। বরং সময় কাটানোর জন্য পড়ে। আজ এমন বৃষ্টির দিনে কে আসবে এ ধরনের কিতাব কিনতে? সুতরাং আজ আর যাবো না, দোকান খুলবো না।

আমার এ ভাই ছিলেন বুযুর্গদের সোহবতধন্য। থানবী (রহ.)-এর সোহবত ও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিলো। তাই তিনি বলেন, উক্ত ভাবনা মনে আসার পরক্ষণেই ভাবলাম, ঠিক আছে, কেউ কিতাব কিনতে আসুক বা না আসুক কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ দোকানটিকেই আমার উপার্জনের অসিলা বানিয়েছেন। সুতরাং আমার কাজ হলো দোকান খুলে বসা। গ্রাহক পাঠানো আমার কাজ নয়। তাই আমি আমার কাজ করবো, আমার কাজে অবহেলা করবো না। বৃষ্টি হচ্ছে হোক। আমাকে দোকান খুলতেই হবে। এ ভেবে আমি ছাতা হাতে নিলাম। কাদা-পানি পাড়ি দিয়ে চললাম দোকানের দিকে। তারপর দোকান খুলে বসে রইলাম। চিন্তা করলাম, আজ তো আর গ্রহাক আসবে না। সুতরাং সময় নষ্ট করে লাভ কী? এর চাইতে ভালো হয় বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করি।

শুরু করে দিলাম কুরআন তেলাওয়াত। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম অভাবনীয় দৃশ্য! মানুষ ছাতা-পাতা মাথায় দিয়ে ছুটে আসছে দোকানের দিকে। আমি অবাক হলাম। ভাবলাম, কিতাব-পত্র তো লোকজনের এখনই দরকার এমন নয়। তাপরও দেখলাম যথেষ্ট বেচা-বিক্রি হলো। এখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মালো যে, এসব গ্রাহক মূলত নিজেরা আসেনি। এদেরকে আসলে অন্য কেউ পাঠিয়েছেন। তিনিই পাঠিয়েছেন, যিনি এ দোকানকে করেছেন আমার রিযিকের জন্য উসিলা।

কর্মবণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে

মোটকথা এই ব্যবস্থাপনা মূলত আল্লাহরই। তিনি তোমার কাছে গ্রাহক পাঠান। গ্রাহকের অন্তরে তোমার দোকানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেন। বলুন তো, এ পর্যন্ত কি কেউ এ বিষয়ে কনফারেন্স করেছিলো যে, এত লোক কাপড় খরিদ করবে। এত লোক চাউল খরিদ করবে আর এত লোক জুতা খরিদ করবে, পেয়ালা কিংবা অন্য কোনো জিনিস। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কনফারেন্স হয় নি। বরং আল্লাহরই কারো অন্তরে প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিলেন, যেন চাউল বা আটা খরিদ করে, যার ফলে খরিদ্দাররা দোকানে যায়, মার্কেটে যায়। নিজের চাহিদা মত জিনিস ক্রয় করে নিয়ে আসে।

জমি-জিরাত থেকে শস্য উৎপাদান করেন কে?

ব্যবসা-বাণিজ্যে জমি-জিরাত ইত্যাকার সবকিছু আল্লাহরই দান। তিনিই এগুলো থেকে অর্থ-সম্পদ বের করে দেন। দেখুন একজন কৃষকের কাজ হলো জমিতে হাল দিয়ে বীজ বপন করে আসা। প্রয়োজনে সেখানে সার-পানি দেয়া। কিন্তু এ বীজকে কিশলয়ে পরিণত করেন তো আল্লাহই। দুর্বল, নগণ্য ও অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ কিভাবে এমন কঠোর জমি ফেঁড়ে বের হয়ে আসে? তারপর সে অংকুরের রূপ নেয়? তিরতিরে এ অংকুরটিই রোদ-বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটা মোকাবেলা করে পরিণত হয় চারাগাছে। সেই চারাটিই একদিন বড় হয়। ফলে-ফুলে ভরে ওঠে। দুনিয়ার মানুষকে উপকৃত করে। কে সেই সত্তা, যিনি এসব কিছু করেন? আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি এসব কিছু এমন সুনিপুণভাবে করেছেন।

মানুষ স্রষ্টা হতে পারে না

সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য জমি-জিরাতসহ আয়ের সকল উৎসই মূলত আল্লাহরই দান। এ দুনিয়াতে মানুষ এসেছে সীমিত কিছু কাজ করার জন্য।

সীমিত সময়ে ওই সীমিত কাজগুলো করা ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতাই তার মাঝে নেই। তাই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তো আল্লাহই দিয়ে দেন। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তাঁরই। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর মালিক আল্লাহ।
–(সূরা বাকরা : ২৮৪)

আল্লাহই প্রকৃত মালিক

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তাঁর অফুরান দয়া দেখুন। তিনি এসব কিছুর মালিক আবার আমাদেরকে করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা ইয়াসিনে ইরশাদ করেছেন–

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ – (سورة يس ٧١)

তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি নিজ হাতের তৈরী বস্তু দ্বারা চতুষ্পদ বস্তু সৃষ্টি করেছি। তারপর তারাই এগুলোর মালিক। –(সূরা ইয়াসিন : ৭১)

সুতরাং আমাদের ধন-সম্পদের মাঝে আল্লাহর হকই সব চেয়ে বেশী। তাই এগুলো আল্লাহর হুকুম মতই ব্যয় করতে হবে। নির্ধারিত অংশ তাঁর রাস্তায় দান করতে হবে। তারপরই অবশিষ্ট সম্পদ আমাদের জন্য হালাল হবে। হবে বরকতময় ও সৌভাগ্যের কারণ। অন্যথায় এ সম্পদই আমাদের জন্য আগুন হয়ে দাঁড়াবে, যা দিয়ে বিচার দিবসে আমাদেরকে দাগ দেয়া হবে।

দিবে শুধু একশ ভাগের আড়াই ভাগ

আল্লাহ যদি বলতেন, আমার দেওয়া অর্থসম্পদ থেকে আমার রাহে ব্যয় করবে সাড়ে সাতানব্বই ভাগ আর আড়াই ভাগ রাখবে নিজের কাছে, তাহলে এটা ইনসাফবিরোধী হতো না মোটেও। কেননা, অর্থসম্পদ সবই তো তাঁর। তিনিই তো এগুলোর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি বরং নিজের বান্দাদের উপর দয়া করেছেন। বলে দিয়েছেন আমি জানি, তোমরা দুর্বল অর্থ-সম্পদের প্রতি রয়েছে তোমাদের প্রবল আর্কষণ। তাই সাড়ে সাতানব্বই ভাগই তোমরা রেখে দাও। বাকি আড়াই ভাগ আমার রাস্তায় খরচ করবে। তখন সাড়ে সাতানব্বই ভাগ তোমার জন্য হালাল হবে, যা তোমাদের জন্য হবে বরকতপূর্ণ। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বৈধ উপায়ে খরচ করতে পারবে।

যাকাতের গুরুত্ব

একশ ভাগের মধ্যে মাত্র আড়াই ভাগ হলো যাকাতের সম্পদ, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكَاةَ –

নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও।

যেখানেই নামাযের কথা এসেছে, সাথে সাথে সেখানে যাকাতের কথাও এসেছে। যাকাতের গুরুত্ব এতটাই দেয়া হয়েছে। এ সম্পদ তো আল্লাহরই। তিনি দয়া করে আমাদেরকে মালিক বানিয়েছেন। আর তাঁর রাস্তায় খরচ করার জন্য মাত্র আড়াই ভাগ চেয়েছেন। কাজেই এমন মুসলমানদের উচিত এটি ঠিকভাবে আদায় করে দেয়া। আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো গড়িমসি না করা। এত অল্প সম্পদ দান করে দিলে তোমার উপর তো আর আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না কিংবা কেয়ামতও চলে আসবে না।

যাকাত হিসাব করে আলাদা করে নাও

অনেকেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তারা যাকাতের হিসাবই করে না। তারা চিন্তা করে, যাকাত দিতে যাবো কেন? সম্পদ আসবে –শুধুই আসবে। যাকাত আবার কী? অপরদিকে অনেকে এমনও আছেন, যারা যাকাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন বটে, দেনও। কিন্তু যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতিটা অবলম্বন করেন না। যেহেতু একশ ভাগের আড়াই ভাগ হলো যাকাতের সম্পদ, সুতরাং উচিত হলো যথাযথভাবে হিসাব করে এ অংশটুকু বের করে নেয়া। তারা মনে করে সঠিক হিসাব বের করার এত ঝামেলা পোহাবার কে? কে যাবে সব স্টক চেক করতে? সুতরাং একটা অনুমান করে দিয়ে দিলেই হলো। কিন্তু এটা ভাবেন না যে, এ অনুমানের মধ্যে তো ভুলও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, যাকাত কম হয়ে গেছে। যদি বেশি হয়, তাহলে তো ভালো কথা। তখন সে ইনশাআল্লাহ এর জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যদি কম হয়, এমনকি এক টাকা কম হলেও মনে রাখবেন, এই এক টাকা আপনার জন্য হারাম আর এ এক টাকাই সমস্ত সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাধারণ সম্পদের সঙ্গে যাকাতের অর্থ মিশে গেলে সেই অর্থই ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এটাই আপনার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

যাকাত আদায়ের পার্থিব লাভ

যাকাত দিতে হবে। নিয়ত থাকতে হবে এটা আল্লাহর বিধান। এটি একটি মহান ইবাদত। তাই পার্থিব লাভ থাক বা না থাক আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দিচ্ছি। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করাই যাকাতের উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দয়া দেখুন। বান্দা যাকাত দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পার্থিব লাভও দান করেন। আর তাহলো তিনি যাকাতের উসিলায় সম্পদে বরকত দান করেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেছেন।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ○ (سورة البقرة ٢٧٦)

তিনি সুদকে মিটিয়ে দেন আর যাকাত ও সদকাকে বাড়িয়ে দেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা যাকাতের সম্পদ আলাদা করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা তাঁর জন্যে এ দু'আ করেন–

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا –

হে আল্লাহ! যে লোকটি আপনার রাস্তায় খরচ করে, তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। আর যে লোকটি নিজের কাছে সম্পদ ধরে রাখে, তাকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী যাকাত অধ্যায়)

এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে–

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ –

আল্লাহর পথে দান করলে সম্পদ কমে যায় না।

খোলাসা কথা হলো, যাকাতে বরকত আসে। হয়ত এদিক থেকে যদিও যাকাতের পেছনে কিছু সম্পদ চলে যায়; কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো কয়েক গুণ পুষিয়ে দেন। কিংবা গণনার দিক থেকে হয়ত সম্পদ বাড়ে না। কিন্তু অবশিষ্ট সম্পদে আল্লাহ এমন বরকত দান করেন, যার ফলে অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারাই সে সুখের জীবন পার করে দিতে পারে।

বরকতশূন্যতার পরিণাম

আজকের দুনিয়া হলো গণনার দুনিয়া। বরকতের অর্থ মানুষ বোঝে না। অল্প বস্তু থেকে অধিক উপকৃত হওয়াকে বরকত বলা হয়। মনে করুন, আপনি আজ অর্থ উপার্জন করলেন বিপুল পরিমাণে। কিন্তু বাসায় গিয়ে দেখলেন, আপনার সন্তান অসুস্থ। তাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। আর একবারের

ডাক্তারি পরীক্ষাতেই শেষ হয়ে গেল আপনার আজকের উপার্জিত সকল টাকা। এই অর্থগুলো আপনার আজকের উপার্জনের বরকত ছিলো না। অথবা মনে করুন আপনি টাকা উপার্জন করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ছিনতাইকারীর কবলে পড়লেন। সে পিস্তল ঠেকিয়ে আপনার সর্বস্ব নিয়ে গেলো। এর অর্থ হলো আপনার উপার্জিত টাকাতে বরকত ছিলো না। কিংবা মনে করুন আপনি উপার্জন করেছেন। সেই টাকা দিয়ে খাবার খেয়েছেন। কিন্তু এতে আপনার পেটের অসুখ হলো। তাহলে বুঝতে হবে এখানেও আপনি বরকত পাননি।

এই বরকত হলো আল্লাহর দান। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাকেই তিনি এ মহান সম্পদ দান করেন। এ জন্যই আমাদেরকে যাকাত দিতে হবে। যাকাতের হিসাব সঠিকভাবে বের করতে হবে। কারণ, এটাও তো আল্লাহর এক মহান হুকুম।

যাকাতের নিসাব

নিসাব বলা হয় শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। এ নিসাবের মালিক না হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। নিসাবের মালিকের উপর যাকাত ফরয। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা বা সাড়ে সাত তোলা সোনা বা এর সমমূল্যের ব্যবসায়িক সম্পদ ইত্যাদি যার কাছে থাকে, সে-ই মালিকে নিসাব তথা নিসাবের মালিক।

সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা

কারো কাছে কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই সেই সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা আছে তাহলো মানুষ মনে করে প্রতিটি টাকাই পূর্ণ একবছর থাকতে হবে। এ ধারণা মূলত সঠিক নয়। বরং কোনো ব্যক্তি বছরের শুরুতে একবার নিসাবের মালিক হলেই সে সাহিবে নিসাব। যেমন মনে করুন এক ব্যক্তি পহেলা রমযানে নিসাবের মালিক হলো। তারপরের বছর যখন পহেলা রমযান এলো তখনও সে নিসাবের মালিক থাকলো। তাহলে এ ব্যক্তিকে সাহিবে নিসাব বলা হবে। বছরের মাঝখানের সময়গুলো যেসব টাকা-পয়সা আসা যাওয়া করেছে, সেগুলো ধর্তব্য নয়। শুধু দেখতে হবে পহেলা রমযানে তার কাছে কত টাকা আছে। তার উপরই যাকাত দিতে হবে। এমনকি এই টাকাগুলোর মধ্যে ওই টাকাও যোগ হবে, যা মাত্র একদিন পূর্বে এসেছে।

যাকাত হিসাব করার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ হাতে থাকে, তার উপরই যাকাত

মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে রামাযানের এক তারিখে ছিলো এক লাখ টাকা। পরবর্তী বছর প্রথম রামাযানের দুদিন পূর্বে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা তার হাতে এসে গেলো। এখন এই দেড় লাখ টাকার উপরই যাকাত ফরয হবে। এটা বলা যাবে না যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এলো মাত্র দুদিন আগে। এ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো তার কাছে এক বছরব্যাপী ছিলো না। সুতরাং এর উপর যাকাত আসবে না। বরং যাকাত হিসাব করার তারিখে যত সম্পদ আপনার মালিকানায় থাকবে এর থেকেই যাকাতের পূর্ববর্তী রামাযানের প্রথম তারিখ থেকে পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক। যেমন পূর্ববর্তী রামাযানের প্রথম তারিখে আপনার কাছে ছিলো এক লাখ টাকা। এখন হিসাব করার দিন আছে দেড় লাখ টাকা। তাহলে যাকাত দিতে হবে দেড় লাখ টাকার। অনুরূপভাবে মনে করুন, পূর্ববর্তী রামাযানের পহেলা তারিখে আপনার কাছে ছিলো দেড় লাখ টাকা। আর এখন হিসাব করার দিন আপনার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাহলে যাকাত দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার। মাঝখানে যে টাকা আপনার ব্যয় হয়েছে, এর কোনো হিসাব নেই। সেই ব্যয়িত টাকার যাকাত বের করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে মাঝখানে আপনার যে টাকা আয় হয়েছে, তার হিসাব রাখাও জরুরি নয়। কারণ, মাঝখানের আয়-ব্যয় যাকাতের হিসাবে বিবেচ্য নয়। বরং দেখতে হবে, যেদিন আপনার বছর পূর্ণ হয়, সেদিন আপনার মালিকানায় কত সম্পদ আছে। আর সেটার উপরই যাকাত আসবে। হিসাব-নিকাশের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে এতটাই সহজ করে দিয়েছেন। এটাই এক বছর পূর্ণ হওয়ার অর্থ।

যাকাতযোগ্য সম্পদ

এটাও আল্লাহ তা'আলার একান্তই দয়া যে, তিনি সব ধরনের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেননি। অন্যথায় সম্পদ তো কত ধরনের আছে। যেসব সম্পদের উপর যাকাত ফরয, তাহলো– (১) নগদ অর্থ তথা নোট, একাউন্ট যেভাবেই থাক এর উপর যাকাত ফরয। (২) সোনা-রুপা, তা অলংকার হোক কিংবা অন্য। কিছু লোক মনে করে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের উপর যাকাত নেই। এ ধারণা সঠিক নয়। বরং সোনা-রুপা দ্বারা তৈরি যে কোনো অলংকারের উপরই যাকাত আসবে। তবে হ্যাঁ, সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো

ধাতু দ্বারা তৈরিকৃত অলংকারের উপর যাকাত আসবে না। যেমন হীরা-জহরতের অলংকারের উপর যাকাত আসবে না, যাবত এগুলো ব্যবসায়ের জন্য না হয়।

যাকাতযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে যুক্তি খোঁজা যাবে না

এক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যাকাত একটি ইবাদত। আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরয বিধান। অথচ অনেকে এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি-যুক্তি দেখাতে চায়। তারা বলে, অমুক জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব কেন এবং অমুক জিনিসের উপর ওয়াজিব নয় কেন? সোনা-রুপার যাকাত ওয়াজিব কিন্তু হীরা জহরতের উপর ওয়াজিব নয় কেন? প্লাটিনামের উপর কেন যাকাত নেই? এ জাতীয় প্রশ্ন ঠিক এমনই যে, মুসাফির জোহর আসর ও ঈশার নামায কসর পড়ে; কিন্তু মাগরিবের ক্ষেত্রে সে কসর পড়ে না কেন? কিংবা এক ব্যক্তি উড়োজাহাজে উড়ে বেড়ায়। তার সফর কত আরামদায়ক। তার জন্য কসর। অথচ আমি করাচির রাস্তায় কত কষ্ট করে বাসে চলাফেরা করি আমার জন্য কসর নয় কেন? এসব প্রশ্ন অবান্তর। এগুলোর একটাই উত্তর। তাহলো এসব আল্লহর ইবাদত। আর ইবাদতের মাঝে বিদ্যমান বিধানাবলী আল্লাহই বলে দিয়েছেন। সেসব বিধানের পাবন্দি জরুরি। অন্যথায় ইবাদত ইবাদত থাকবে না। এক্ষেত্রে যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো যাবে না।

ইবাদত করা আল্লাহরই নির্দেশ

অথবা মনে করুন, এক ব্যক্তি বললো, জিলহজ্জের নবম তারিখে হজ্ব করতে হয়। অথচ আমার জন্য সহজ হলো এখন গিয়ে হজ্ব করে আসা। প্রয়োজনে একদিনের পরিবর্তে আমি আরাফাতে তিন দিন অবস্থান করবো। বলুন, এ ব্যক্তির কি হজ্ব হবে? একদিনের পরিবর্তে তিনদিন অবস্থান করলেও তার হজ্ব তো হবে না। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার বাতলানো পদ্ধতিতে ইবাদত করেনি। সুতরাং সোনা-রুপাতে যাকাত কেন? আর হীরার ক্ষেত্রে যাকাত নেই কেন? এ জাতীয় প্রশ্নও ঠিক এমনই। ইবাদতের মাঝে যুক্তি চালানো যাবে না।

ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

ব্যবসাপণ্যের উপরও যাকাত ফরয। যেমন বিক্রির জন্য দোকানে যেসব পণ্য স্টক আছে, সেগুলোর উপর যাকাত ফরয। তবে এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা আছে যে, যাকাত দানকারী তার ব্যবসাপণ্য

হিসাব করার সময় এভাবে হিসাব করবে যে, যদি সে তার স্টকের সব পণ্য মার্কেট থেকে খরিদ করে, তাহলে মূল্য কত হবে। যাকাতদাতা সেই মূল্যমানের উপরই যাকাত দিবে। দেখুন, মূল্যমান দু'ধরনের হতে পারে। 'রিট্যাল প্রাইস' এবং 'হোলসেল প্রাইস'। তবে সতর্কতা হলো, 'হোলসেল প্রাইস' তথা বিক্রির পাইকারী মূল্য ধরেই তা থেকে আড়াই শতাংশ যাকাত দেয়া।

কোন্ কোন্ জিনিস ব্যবসাপণ্য

বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট, প্লট ও গাড়ী-বাড়ী ব্যবসাপণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং এগুলো কেনার সময় যদি শুরুতেই মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এগুলোর উপর যাকাত দিতে হবে। অনেকে ইনস্টুসেন্টের নিয়তে প্লট খরিদ করেন। শুরুতেই তাদের নিয়ত থাকে, লাভে বিক্রি করতে পারলে বিক্রি করে দেবো। সুতরাং এ ধরনের প্লটের মূল্যমানের উপর যাকাত আসবে। আবার অনেকের নিয়ত থাকে, সুযোগ-সুবিধা হলে বসবাসের জন্য সেখানে ভবন বানাবে। আবার সুবিধামতো তা ভাড়াও দিয়ে দিতে পারে কিংবা বিক্রিও করে দিতে পারে। অর্থাৎ স্পষ্ট ও নির্ধারিত কোনো নিয়ত তার নেই। বরং এমনিতেই খরিদ করেছে আর কি। তাহলে এ সূরতে ওই প্লটের উপর যাকাত আসবে না। সারকথা হলো, যাকাত শুধু এক সূরতে ওয়াজিব হয় তথা বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনলে যাকাত ওয়াজিব হয়। সুতরাং কেনার সময় যদি বসবাসের নিয়ত থাকে এবং পরবর্তীতে নিয়ত পাল্টে যায়, পরবর্তীতে সে ভেবেছে, বিক্রি করে মুনাফা ভোগ করবে। তাহলে শুধু নিয়ত ও ইচ্ছার পরিবর্তনের কারণে ক্রয়কৃত প্লটের উপর যাকাত আসবে না। তবে হ্যাঁ, ইচ্ছার পরিবর্তনের পর যদি তা বাস্তবেই বিক্রি করে দেয়, তাহলে যাকাত আসবে। মোদ্দাকথা, খরিদ করার সময় পুনরায় বিক্রি করার নিয়ত থাকলে ঐ পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আসবে।

কোন্ মূল্যমান বিবেচিত হবে

এখানে মনে রাখতে হবে, যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব করবেন, সেদিনের দামই ধরতে হবে। যেমন এক লাখ টাকা দিয়ে আপনি একটি প্লট খরিদ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তার বাজার মূল্য হলো দশ লাখ টাকা। তাহলে যাকাত দিবেন দশ লাখ টাকার আড়াই ভাগ। শুধু এক লাখ টাকার হিসাবে যাকাত দিলে যথেষ্ট হবে না।

কোম্পানীর শেয়ারের উপর যাকাতের বিধান

অনুরূপভাবে কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। শেয়ার দু'ধরনের হয়ে থাকে। (এক) আপনি কোনো কোম্পানীর শেয়ার এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করলেন যে, এর দ্বারা আপনি কোম্পানীর মুনাফা (dividend) ভোগ করবেন। অর্থাৎ আনুপাতিকহারে কোম্পানীর বাৎসরিক মুনাফা হাসিল করাই আপনার উদ্দেশ্য। (দুই) আপনি কোম্পানীর শেয়ার নিয়েছেন ক্যাপিট্যাল গেইনের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ বাৎসরিক মুনাফা আপনার উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো, দাম বাড়লে শেয়ারটা বিক্রি করে মুনাফা লাভ করবেন। এই দ্বিতীয় অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী শেয়ারের পুরো মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন আপনি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কোম্পানীর একটি শেয়ার কিনলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, এটির মূল্য বেড়ে গেলে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন। তারপর যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব বের করেছেন, সেদিন শেয়ারটির মার্কেট ভ্যালু ষাট টাকায় দাঁড়ালো। তাহলে শেয়ারের দাম ষাট টাকা ধরেই যাকাত দিতে হবে একশ ভাগের আড়াই ভাগ।

আর যদি বাৎসরিক মুনাফা হাসিলই আপনার আসল লক্ষ্য হয়, এই অবস্থায় শেয়ারসমূহের কেবল ওই অংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যেটা যাকাতের যোগ্য মালের মোকাবেলায় হবে।

বিষয়টি এমন–

ধরা যাক, শেয়ার মার্কেটে ভ্যালু ১০০ টাকা। এর মধ্যে ৬০ টাকা বিল্ডিং ও মেশিনারীর মোকাবেলায়। ৪০ টাকা কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য ও নগদ টাকার মোকাবেলায়। এখানে যেহেতু এ শেয়ারের ৪০ টাকা যাকাতযোগ্য অংশসমূহের মোকাবেলায়, সেহেতু শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে ৪০ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব। বাকি ৬০ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি কোম্পানীর বিল্ডিং ও মেশিনারীর বিস্তারিত বিবরণ জানা না থাকে, তাহলে তা যেকোনো ভাবে জেনে নিতে হবে। এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সতর্কতাস্বরূপ পুরা শেয়ারের মার্কেট ভ্যালুর উপরই যাকাত দেয়া উচিত।

কারখানার যেসব মাল যাকাতযোগ্য

ফ্যাক্টরির উৎপাদিত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। সুতরাং উৎপাদিত মালের মূল্য ধরে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের কাঁচামালের মূল্যের উপরও যাকাত আসবে। কেননা, এগুলো যাকাতযোগ্য

সম্পদ। কিন্তু ফ্যাক্টরির বিল্ডিং, মেশিনারী, ফার্নিচার, গাড়ি ইত্যাদি যাকাতযোগ্য নয়। সুতরাং এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারবারের অংশীদার হওয়ার জন্য টাকা লাগিয়ে রাখে এবং ওই কারবারের আনুপাতিক অংশের সে মালিক হয়, তাহলে সে যতটুকুর মালিক, ততটুকুর বাজারমূল্য হিসাবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

সারকথা, ব্যাংক ব্যালেন্স, প্রাইজবন্ড, ডিফেন্স, সেভিং সার্টিফিকেটসহ নগদ টাকার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর উৎপাদিত দ্রব্য, কাঁচামাল ও উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন মাল ব্যবসাপণ্য হিসাবে ধরা হবে। কোম্পানীর শেয়ার ও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যেকোনো জিনিসই ব্যবসাপণ্য হিসাবে ধরা হবে। সুতরাং এগুলোর মূল্যমানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ঋণ হিসাবে লাগানো টাকার যাকাত

উসূলের নিশ্চয়তাসম্পন্ন ঋণের টাকা যেমন– যেই ঋণ কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে কিংবা ব্যবসায়ী মাল বাকিতে বিক্রি করে রেখেছে, যার মূল্য অবশ্যই উসূল হবে। যাকাতের হিসাবের সময় উত্তম হলো এ ঋণও মোট মালের সঙ্গে যোগ করে নেয়া। যদিও শরীয়তের বিধান হলো, যে ঋণ এখনও উসূল করা যায় নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা উসূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যখন উসূল হবে, তখন যত বছর এ ঋণের উপর গত হয়েছে তত বছরের যাকাত দিতে হবে। যেমন ধরুন, আপনি একজনের কাছে এক লাখ টাকা রেখেছেন ঋণ হিসাবে। পাঁচ বছর পর এ টাকাটা আপনি ফেরত পেলেন। এখন যদিও প্রতি বছর এর যাকাত আপনাকে দিতে হয়নি; কিন্তু যখন পেয়েছেন, তখন এ বিগত পাঁচ বছরের যাকাতই আপনাকে দিতে হবে। আর যেহেতু একসাথে পাঁচ বছরের যাকাত দেয়া অনেক সময় কষ্টকর মনে হয়, তাই আপনার জন্য উত্তম হলো, প্রতি বছরই এ এক লাখের যাকাত আদায় করা। সুতরাং যাকাতের হিসাব বের করার সময় যাকাতযোগ্য মোট সম্পদের এ এক লাখ টাকাও হিসাব করে নিবেন। এটাই উত্তম এবং সহজও।

দায়-দেনা বিয়োগ

অপর দিকে যাকাতের হিসাব বের করার সময় আপনাকে দেখতে হবে, আপনার জিম্মায় অন্যান্যদের কত টাকা ঋণ আছে। অর্থাৎ আপনি কত টাকা

দায়-দেনা আছেন। সর্বমোট সম্পদ বা তার মূল্য থেকে এ ঋণগুলোকে বিয়োগ করে দিবেন। বিয়োগ দেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে, সেটাই যাকাত প্রদানযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তারপর যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। উত্তম হলো যাকাতের এই ২.৫% সম্পূর্ণ আলাদা করে নেয়া। তারপর সময়ে-সময়ে তা থেকে যাকাতের হকদারদের মাঝে খরচ করা। খোলাসা কথা হলো, যাকাতের হিসাব বের করার এটাই নিয়ম।

দায়-দেনা দুই প্রকার

ঋণ তথা দায়-দেনা সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বুঝে নিতে হবে। তাহলো, দায়-দেনা দুই প্রকার। এক. সাধারণ দায়-দেনা। মানুষ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে যে ঋণ করে, তাকে বলা হয় সাধারণ দায়-দেনা। দুই. বড়-বড় মালদাররা নিজের প্রোডাক্ট বা ক্যাপিটল বৃদ্ধির জন্য লোন নিয়ে থাকে। যেমন ফ্যাক্টরী করার জন্য বা মেশিনারী দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অথবা ব্যবসাপণ্য ইম্পোর্ট করার জন্য তারা ঋণ নিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণকে বলা হয় কমার্শিয়াল লোন। যেমন ধরুন, একজন পুঁজিপতি বর্তমানে দু'টি ফ্যাক্টরির মালিক। কিন্তু সে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে তৃতীয় আরেকটি ফ্যাক্টরী করার জন্য। এখন যদি তার এ ব্যাংক লোনকে তার সর্বমোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে তার উপর তো যাকাত আসবেই না, বরং হতে পারে সে নিজেই যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। দৃশ্যত সে একজন ঋণগ্রস্ত ফকীরে পরিণত হবে। একারণেই ইসলামী শরীয়তে লোন তথা দায়-দেনা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

কমার্শিয়াল লোন বিয়োগ দেয়া হবে কখন?

এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, প্রথম প্রকারের ঋণ যা সাধারণ ঋণ নামে অভিহিত। যাকাতের হিসাব করার সময় তা মোট সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে। বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদই যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ কে কমার্শিয়াল লোন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, দেখতে হবে, এ ঋণটা কোন খাতে সে ব্যয় করেছে। যদি যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ যেমন– কাঁচামাল খরিদ কিংবা ব্যবসাপণ্য ক্রয়ের জন্য সে ব্যয় করে থাকে, তাহলে তার মোট সম্পদ থেকে এ ঋণকেও বিয়োগ দেয়া হবে। আর যদি যাকাত প্রদানযোগ্য নয় এমন খাতে ব্যয় করে, যেমন সে এ ঋণের টাকা দিয়ে ফার্নিচার খরিদ করল, তাহলে তার মোট সম্পদ থেকে এ ঋণকে বিয়োগ দেয়া যাবে না।

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিলো। এ টাকা দিয়ে সে বিদেশ থেকে একটি প্ল্যান্ট (মেশিনারী দ্রব্য) ইম্পোর্ট করলো। যেহেতু এ প্ল্যান্ট যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়, সুতরাং যাকাতের হিসাব করার সময় মোট হিসাব থেকে এ ঋণটাকে বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু যদি সে এ টাকা দিয়ে কাঁচামাল খরিদ করে, তাহলে কাঁচামাল যেহেতু যাকাতযোগ্য সম্পদ,তাই যাকাতের হিসাব করার সময় ঋণের এ টাকাকে বাদ দেয়া হবে। কেননা, এ কাঁচামাল তো যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাবে মোট সম্পদের সঙ্গে এমনিতেই যোগ করা হয়েছে।

সারকথা হলো, সাধারণ ঋণ সম্পূর্ণটাই মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া হবে। আর কমার্শিয়াল ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, যদি তা যাকাত প্রদানযোগ্য নয় এমন খাতে ব্যয়িত হয়, তাহলে তাকে মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে যাকাত প্রদানযোগ্য খাতে ব্যয়িত হলে তাকেও বিয়োগ দেয়া হবে।

যাকাত দিবেন হকদারদেরকে

ইসলামী শরীয়ত কিছু লোককে যাকাত পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত করেছে। এদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসরাফ বা হকদার। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এটা বলেন নি যে, যাকাত বের করো বা যাকাত নিক্ষেপ করো। বরং তিনি বলেছেন, اٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত আদায় করো।' অর্থাৎ– যাকাত সেখানে দাও, যেখানে ইসলাম যাকাত দিতে বলেছে। অনেকেই যাকাত সঠিকভাবে বের করেন ঠিক, কিন্তু সঠিক পাত্রে গেলো কিনা খেয়াল রাখেন না। যাকাত বের করে একজনের জিম্মায় দিয়ে দেন। খতিয়ে দেখেন না ওই লোকটি যথাযথ খাতে ব্যয় করলো কিনা। বর্তমানে দুনিয়াতে এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো যাকাতের টাকা গ্রহণ করে ঠিক, কিন্তু যথাযোগ্য খাতে ব্যয় করার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, যাকাত আদায় করা। অর্থাৎ– যাকাতের হকদারদেরকে যাকাত দাও।

হকদার কে?

এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যাকাত তাকেই দিবে, যে সাহিবে নিসাব নয়। সুতরাং সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের সমপরিমাণ মূল্যের মালিককে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে

এক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান হলো হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যেন সে নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারে। একারণেই বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যাকাত দেয়া যাবে না। কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনের জন্য এ অর্থ খরচ করা যাবে না। এরূপ অনুমতি দেয়া হলে তো যাকাতের সম্পদ সব লুটে-পুটে খেয়ে ফেলবে। এজন্যই বলা হয়েছে, এ যাকাত ফকির, মিসকীন ও দুর্বলদের হক, যারা নিসাবের মালিক নয়। সুতরাং তাদেরকেই যাকাতের অর্থ দাও। যখন তাদেরকে মালিক বানিয়ে যাকাত দিবে, তখনি যাকাত আদায় হবে।

যেসব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া যাবে

যাকাত আদায়ের এ বিধানটিই যাকাতদাতার মাঝে এ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে যে, আমাকে যাকাত দিতে হবে যথাযোগ্য পাত্রে। তাই সে যাকাতের হকদারদেরকে খোঁজ করে থাকে। হকদারদের একটা তালিকাও হয়ত সে করে। তারপর তাদের কাছে যাকাত পৌঁছিয়ে দেয়। নিজের এলাকায়, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে যাকাতের হকদার খুঁজে বের করা আপনার কর্তব্য। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো, আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া। এতে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। প্রথমত, যাকাত আদায়ের সাওয়াব। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব। শুধু দু'ধরনের নিকটাত্মীয় ছাড়া সব আত্মীয়কেই যাকাত দেয়া যায়। প্রথমত, জন্মসূত্রের নিকটাত্মীয়। যেমন– ছেলে নিজ পিতাকে এবং পিতা নিজ সন্তানকে যাকাত দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিবাহসূত্রের আত্মীয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে যাকাত দিতে পারে না। এ দু'শ্রেণীর আত্মীয় ছাড়া যেকোনো আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে। যেমন– ভাই, বোন, চাচা, খালা, মামা, ফুফুকে যাকাত দেয়া যাবে। এরা যাকাতের হকদার হলে এদেরকে যাকাত দেয়াই উত্তম।

বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেয়ার বিধান

অনেকের ধারণা, বিধবা নারীকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে যাকাত দেয়া যায় না। অথচ এক্ষেত্রেও দেখতে হয় ওই বিধবা যাকাতের হকদার কিনা। যদি হকদার হয়, তাহলে বিধবাকে সাহায্য করা খুবই ভালো। কিন্তু যদি হকদার না হয়, তাহলে শুধু বিধবা হওয়ার কারণে তাকে যাকাত দিলে আদায় হবে না। অনুরূপভাবে এতিমের ক্ষেত্রেও একই কথা। এতিম যদি নিজেই নিসাবের মালিক হয়, তাহলে তাকেও যাকাত দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, নিসাবের মালিক না হলে অবশ্যই তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

ব্যাংকে যাকাত কেটে রাখার হুকুম

ইদানিং সরকারীভাবে যাকাত কেটে রাখার একটা নিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে দেখা যায়, অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ গ্রাহক থেকে যাকাত কেটে নেয়। বিভিন্ন কোম্পানীও যাকাত কেটে রেখে সরকারকে দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো–

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাকাত কেটে নিলে এর দ্বারা যার থেকে যাকাত উসূল করা হয়েছে, তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, পহেলা রামাযান আসার পূর্বেই মনে-মনে এ নিয়ত করে নিবে যে, আমার টাকা থেকে যে যাকাত কাটা হবে, তা আমি আদায় করছি। এর দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার তাকে যাকাত দিতে হবে না।

এক্ষেত্রে অনেকের মনে এ সংশয় থাকে যে, আমার সব টাকার উপর তো এক বছর গত হয়নি। এ সংশয়ের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে, টাকার প্রত্যেক অংকের উপর এক বছর গত হওয়া জরুরী নয়। বরং আপনি নিসাবের মালিক হলে বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বেও আপনার হাতে কোনো টাকা এলে তারও যাকাত দিতে হবে। সুতরাং ব্যাংক যা করে, তা ঠিকই করে।

একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বাদ দেয়া হবে কিভাবে?

যদি কারো সকল সম্পদ ব্যাংকেই থাকে– নিজের কাছে কোনো কিছুই না থাকে, অপরদিকে তার কিছু দায়-দেনাও যদি থাকে, তাহলে ব্যাংক তো তারিখ আসার সঙ্গে সঙ্গে এ লোকের একাউন্টের সম্পূর্ণ টাকা থেকে যাকাত কেটে নিবে। তার দায়-দেনাগুলো ব্যাংক বাদ দিবে না। ফলে যাকাত কাটা হবে অনেক বেশী। এ ব্যক্তির জন্য সমাধান হলো, তারিখ আসার পূর্বেই যেন সে ব্যাংক থেকে সব টাকা উঠিয়ে নেয় কিংবা কারেন্ট একাউন্টে রেখে দেয়। তারপর সে নিজের যাকাত যেন নিজেই হিসাব করে দেয়। এমনিতে প্রত্যেকেরই জন্য উচিত হলো কারেন্ট একাউন্টে লেনদেন করা। সেভিংস একাউন্টে লেনদেন করা মোটেও উচিত নয়। কারণ, সেভিংস একাউন্ট তো সুদি একাউন্ট। আর কারেন্ট একাউন্ট থেকে যাকাত কাটা হয় না। দ্বিতীয় সমাধান হলো, সে ব্যাংকের কাছে লিখিতভাবে এ তথ্য জানিয়ে দিবে যে, আমি সাহিবে নিসাব নই। লিখিতভাবে এটা জানানোর পর ব্যাংক আইনত তার একাউন্ট থেকে যাকাত কেটে রাখতে পারবে না।

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত কাটা

আরেকটি মাসআলা হলো কোম্পানীর শেয়ারবিষয়ক। কোম্পানী যখন শেয়ারগুলোর বাৎসরিক মুনাফা বন্টন করে, তখন কোম্পানী যাকাত কেটে রাখে। কিন্তু কোম্পানী যখন যাকাত কাটে, তখন শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (Face value) হিসাবে যাকাত কাটে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব শেয়ারের যাকাত হবে মার্কেট ভ্যালু হিসাবে। সুতরাং অভিহিত মূল্যের ভিত্তিতে যা কাটতি হয়েছে, ততটুকু যাকাত আদায় হয়ে গেছে। তবে অভিহিত মূল্য এবং মার্কেট মূল্যের মাঝে যে মূল্য ব্যবধান আছে, অবশিষ্ট সে ব্যবধান মূল্যেরও যাকাত দিতে হবে। যেমন একটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য মনে করুন পঞ্চাশ টাকা। আর মার্কেট মূল্য হলো ষাট টাকা। কোম্পানী তো যাকাত কাটার সময় পঞ্চাশ টাকা ধরে কেটেছে। সুতরাং আপনাকে অবশিষ্ট দশ টাকারও যাকাত হিসাব করে দিয়ে দিতে হবে।

যাকাতের তারিখ কী হওয়া উচিত

একটা কথা বুঝে রাখুন, যাকাত আদায়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। মাসও নেই। বরং মানুষভেদে যাকাতের তারিখও ভিন্ন হতে পারে। শরীয়ত বলে, যাকাতের আসল তারিখ তো সেদিন যেদিন আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন। যেমন এক ব্যক্তি পহেলা মুহররম সর্বপ্রথম সাহিবে নিসাব হলো। সুতরাং তার জন্য যাকাতের তারিখ হবে পহেলা মুহররম। এখন থেকে সে প্রতিবছর পহেলা মুহররমেই যাকাতের হিসাব করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষেরই মনে থাকে না, সে নিসাবের মালিক হয়েছে কবে বা কখন। এই অপারগতার সূরতে সে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তারিখেই যাকাতের হিসাব করতে হবে। তার জন্য যে তারিখটা সহজ হয়, সেই তারিখটা ধরলেই হবে।

পহেলা রামাযান কি যাকাতের তারিখ হিসাবে ধরা যাবে?

সাধারণত মানুষ পহেলা রামাযানে যাকাত বের করে। এর কারণ হলো, হাদীস শরীফে এসেছে, রামাযানের একটি ফরযের সাওয়াবকে বাড়িয়ে সত্তর গুণ করে দেয়া হয়। সুতরাং রামাযানে যাকাত আদায় করলে সত্তর গুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বিষয়টি যথাস্থানে ঠিক আছে এবং ভালোও। কিন্তু যে ব্যক্তির জানা আছে যে, সে কখন সাহিবে নিসাব হয়েছে, সে ব্যক্তি শুধু এ জযবার কারণে পহেলা রামাযানকে যাকাত বের করার তারিখ হিসাবে নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না।

তবে সে পুরো বছর যাকাত দিতে পারবে, রামাযানেও পারবে। তাই হিসাবের তারিখ থেকে পুরা বছর কিছু-কিছু করে যাকাত দিতে থাকলে এবং অবশিষ্টটা রামাযানে দিলেও যাকাত আদায় হবে এবং রামাযানের ফযীলতও সে পাবে।

যাহোক, যাকাতের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বললাম। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

কুমন্ত্রনা কি আপনাকে চিন্তিত করে?

"দেখুন, যদি আমাদের নামায হতো নিরংকুশ ও পবিত্র। যাবতীয় ভাবনা, অসঅসা ও কুমন্ত্রনা থেকে মুক্ত। পরিপূর্ন খুশু—খুযুসমৃদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ভাবনাই যদি আমাদের নামাযে না আসতো। এ মহান নেয়ামত যদি আমরা পেয়ে যেতাম, তাহলে অহংকার, আত্মশ্লাঘা ও অহমিকার মতো আপদগুলোতে না জানি আমরা কতটা ডুবে থাকতাম।"

কুমন্ত্রণা কি আপনাকে চিন্তিত করে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

খারাপ কল্পনা-জল্পনার আনাগোনা ঈমানের আলামত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অসঅসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, অন্তরে যে কুফ্‌র-শির্‌ক ও পাপ-তাপের কুমন্ত্রণা আসে, অন্তর যখন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে, তখন তার হুকুম কী?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ذَاكَ مَحْضُ الْاِيْمَانِ এই অসঅসা ঈমানের আলামত বৈ কিছু নয়। সুতরাং অলসতা এলে ঘাবড়ে যেওনা, নিরাশ হয়ে পড়ো না। এ কারণে বেশি অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা ঈমানের আলামত এবং খালেছ ঈমানের নিদর্শন।

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় আমার অন্তরে এমন কুমন্ত্রণা আসে, যা মুখে প্রকাশ করার চাইতে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াই আমার কাছে অধিক শ্রেয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা তো ঈমানের আলামত।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলেন, কুমন্ত্রণা শয়তানের কাজ। কারণ, শয়তানই মানুষের অন্তরে অসঅসা সৃষ্টি করে। আর শয়তান হলো ঈমানচোর। সে তোমাদের ঈমান হাতিয়ে নিতে চায়। যে ঘরে সম্পদ আছে, সে ঘরেই চোর-ডাকাত আসে। যদি সম্পদই না থাকে, তাহলে চোর-ডাকাতের দৃষ্টি সেদিকে আর পড়ে না। সুতরাং শয়তান তোমার অন্তরে প্রবেশ করলে, তোমাদের কুমন্ত্রণা দিলে বুঝে নিবে যে, তোমার মাঝে ঈমানের দৌলত আছে। তাই ঘাবড়াবে না। এই যে তুমি বলছো, তোমার অন্তরে এমন অসঅসা আসে, কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা প্রকাশে তুমি ভয় পাচ্ছ। ভাবছো, এটা প্রকাশ না করার চাইতে আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাওয়াই ভালো। মূলত তোমার এ জাতীয় ভাবনা ঈমানেরই আলামত। যদি অন্তরে ঈমান না থাকতো, তাহলে তুমি এটা কখনও ভাবতে না।

অসঅসার কারণে পাকড়াও হবে না

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

اَلْحَمْدُلله الَّذِىْ رَدَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ اِلَى الْوَسْوَسَةِ –

অর্থাৎ– শোকর আল্লাহ তা'আলার, যিনি শয়তানের চতুরতাকে অসঅসা তথা কুমন্ত্রণা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। সে এর চাইতে বেশি কিছু করতে পারে না।

অপর হাদীসে তিনি আরো বলেছেন–

اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَاوَسْوَسَتْ بِه صُدُوْرُهَا –

অর্থাৎ– আমার উম্মতের অন্তরে যে অসঅসা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিয়েছেন। এ অসঅসার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। অবশ্য আ'মলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে নানা ভাবনা

অসঅসা তথা কুমন্ত্রণা দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, আক্বীদা সংক্রান্ত কুমন্ত্রণা যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা আখেরাত সম্পর্কে এ ধারণা এলো যে আসলেই এসবের অস্তিত্ব আছে কিনা। এ ধরনের কুমন্ত্রণার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা একথাই পেয়েছি। সুতরাং এ ধরনের কুমন্ত্রণার কারণে কেউ কাফের হয়ে যাবে না। এ জাতীয় অসঅসার

কারণে অনেকে খুব শংকিত হয়ে পড়ে। মনে করে, আমি শয়তান হয়ে গেলাম, কাফের বনে গেলাম। মনে রাখবেন, শুধু অসঅসা বা কুমন্ত্রণার কারণে কেউ শয়তান কিংবা কাফের হয়ে যায় না। দিল, যবান ও আমলের মধ্য দিয়ে ঈমান ফুটে উঠলে সে-ই মুমিন। তাকে আশ্বস্ত থাকতে হয় নিজের ঈমানের ব্যাপারে।

গুনাহের নানা চিন্তা

দ্বিতীয়, গুনাহ-সংক্রান্ত কুমন্ত্রণা। যেমন– কোনো গুনাহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, কোনো গুনাহ করতে মনে চাওয়া। এ ধরনের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শুধু অন্তরে ইচ্ছা জাগার কারণে কোনো ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। হ্যাঁ, ইচ্ছানুযায়ী গুনাহ করে ফেললে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। সুতরাং গুনাহ করার কুমন্ত্রণা অন্তরে খচখচ করে উঠলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে, হে আল্লাহ! অমুক গুনাহটি করার ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগছে। আপনি আমাকে দয়া করুন। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে গুনাহটি থেকে বাঁচিয়ে নিন।

ফিরে যাও আল্লাহর কাছে

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে এসেছে। তিনি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যার ফলে তার অন্তরে গুনাহের অসঅসা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি সে সময় সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহর কাছে। তাঁর কাছে দু'আ করেছিলেন এভাবে–

إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ

'হে আল্লাহ! যদি এসব নারীর চতুরতা আমার কাছ থেকে হটিয়ে না দেন, তাহলে আমি তো একজন মানুষ। তাই এদের দিকে ঝুঁকে পড়াটাই স্বাভাবিক। তখন তো আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। সুতরাং আমাকে এসব নারীর ছলনা থেকে হেফাজত করুন।

কাজেই গুনাহের ইচ্ছা অন্তরের মাঝে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গেই-সঙ্গেই তাওবা করে নিবে। তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নুতন করে সাহস সঞ্চয় করে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করবে যে, কুমন্ত্রণা যতই দাপাদাপি করুক, আমি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবো না। এভাবে করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' কুমন্ত্রণা চলে যাবে।

যেসব অসঅসা নামাযে আসে

কুমন্ত্রণার আরেকটি প্রকার আছে। অবশ্য এটা মুবাহ। তবুও এ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। এটি গুনাহের অসঅসা নয়। গুনাহ্ করার ইচ্ছাও নয়। তবে এ ধরনের কুমন্ত্রণা ইবাদাতের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যেমন- নামাযের নিয়ত বেঁধেছেন। এরই মধ্যেই রাজ্যের ভাবনার আনাগোনা শুরু হলো। যেসব ভাবনা গুনাহের ভাবনা নয়। যেমন পানাহার, স্ত্রী-সন্তান, ব্যবসা-উপার্জনসহ শিরোনামহীন নানা ভাবনা। এসব ভাবনা মূলত গুনাহ্ নয়। তবে নামাযের ভেতর শুরু হওয়ার কারণে নামাযেও মন বসছে না ঠিকমত। এসবের কারণে নষ্ট হচ্ছে নামাযের একাগ্রতা। তবে এসব ভাবনা যেহেতু মানুষের ইখতিয়ারাধীন নয়, তাই আশা করা যায় 'ইনশাআল্লাহ' এসবের জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। তবে নামায শুরু করার পর এসব ভাবনা নিয়মতান্ত্রিক করে নেয়া যাবে না। কিংবা নিজে ইচ্ছা করেও এসব ভাবনা আনা যাবে না। বরং নামায শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে মন সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসবে নামাযের বাড়িতে। ছানা পড়ার সময় সেদিকেই খেয়াল রাখবে। সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের সময় ধ্যান রাখবে এর মাঝেই। এরপরেও যদি অন্তর এদিক সেদিক চলে যায়, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিবেন। তবে যখনই মনে পড়বে, তখনই মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে নামাযের অন্তপ্রাণে। বারবার এভাবে করতে থাকলে দেখবে ভাবনার আনাগোনাও কমে গেছে। এরই উসিলায় 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তোমাকে খুশু-খুজুর দৌলতও নসিব করবেন।

নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না

যাহোক, নামাযের মধ্যে এসব ভাবনার আনাগেনার কারণে অনেকেই খুব পেরেশান হয়ে পড়েন। মনে করেন, এসবের কারণে আমাদের নামায ঝুলন্ত হয়ে আছে। রূহবিহীন নামাযই আমরা পড়ছি। মনে রাখবেন, এটা নামাযের অবমূল্যায়ন। এ ধরনের অবমূল্যায়ন নামাযের মত একটি মহান ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুচিত। নামায পড়ার তাওফীক যে মহান আল্লাহ আপনাকে দিচ্ছেন, এটা চাট্টিখানি কথা নয়। এ তো তাঁরই একান্ত দয়া। তাই শোকর আদায় করুন। এসব বিচিত্র ভাবনার কারণে নামাযকে বিফল ভাববেন না। নামায পড়ার তাওফীক হওয়া এ তো আল্লাহরই নেয়ামত। সুতরাং আপনার অনিচ্ছায় যদি নানা ভাবনার বিড়ম্বনার মুখোমুখী আপনাকে হতে হয়, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা এর জন্য আপনাকে পাকড়াও করবেন না। শুধু আপনার ইচ্ছায় না হলেই হয়।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ঘটনা

ইমাম গাযালী (রহ.)-কে আমরা সকলেই জানি। তিনি অনেক বড় আলেম ও সূফি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন সুমহান মর্যাদা। তাঁর এক ভাই ছিলেন সূফি প্রকৃতির। ইমাম গাযালী যখন ইমামতি করতেন, তখন তাঁর এ ভাই তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। একবার তিনি ইমাম গাযালীর পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলেন। বিষয়টি তাঁদের আম্মার কানে গেলো। তাই তিনি তাঁর এ সূফি ছেলেকে ডেকে বললেন, কী ব্যাপার তুমি গাযালীর পেছনে নামায পড়ছো না কেন? তিনি মাকে উত্তর দিলেন, তাঁর আবার নামায, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়বো কিভাবে? তিনি যখন নামাযে দাঁড়ান, তখন হায়েয-নিফাসের নানা মাসআলা তাঁর মাথায় গিজগিজ করে। আম্মাজান! আপনিই বলুন, এ অপবিত্র জিনিস যার মাথায় ভর করে থাকে, তাঁর পেছনে কি নামায পড়া যায়?

মাও তো আর সাধারণ মা নন। তিনি তো ছিলেন ইমাম গাযালীর মা। তাই তিনি উত্তর দিলেন, নামাযের মধ্যে ফিক্‌হী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা নাজায়েয নয়। আর তুমি কী কর? তুমি তো তোমার ভাইয়ের দোষ ধরার পেছনে লেগে থাক। আর এ কাজটি নামাযের ভেতরেই কর। নামায পড়াকালীন অপরের দোষ খোঁজ করা তো হারাম। সুতরাং তুমিই বলো, সে উত্তম না তুমি উত্তম?

যাহোক, ইমাম গাযালী (রহ.)-এর আম্মা তাঁর ছেলেকে এটাই বুঝিয়ে ছিলেন যে, নামাযের মাঝে ফিক্‌হী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা গুনাহ নয়। সুতরাং এটা নামাযের একাগ্রতা পরিপন্থী নয়।

কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা

কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত করার সময় তা নিয়ে চিন্তা করার কথা বলা হযেছে। এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর এ কাজটিই করে যাচ্ছে। নামাযের ভেতর সে তেলাওয়াতকৃত আয়াত নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। আয়াতটির মর্মবাণী নিয়ে এদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করছে। বিভিন্ন ভেদ ও মাসআলা নিয়ে ভাবছে। এসবই তার জন্য জায়েয। বরং এটাও ইবাদতেরই অংশ। ইচ্ছাকৃতভাবেও এরূপ করা যাবে। পক্ষান্তরে যেসব ভাবনা ইবাদতের অংশ নয়, সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে আনা যাবে না। যেমন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর ভাবছে, কিভাবে আমি অর্থ উপার্জন করবো, কিভাবে ব্যয় করবো। এ জাতীয় ইত্যকার ভাবনায় সে ডুবে আছে। এসব ভাবনা তার ইচ্ছায় নয় বরং

অনিচ্ছাকৃতভাবে আসছে। তাহলে এতে তার নামাযের খুশু-খুযুর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে খেয়াল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ থেকে ফিরে না এলে বরং এ থেকে মজা নিতে থাকলে তা জায়েয হবে না। তাই যখন খেয়াল হবে যে আমি তো দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে আছি, তখনই চকিত হয়ে নামাযে ফিরে আসতে হবে। ভাবনার মোড় নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এলো। বিষণ্নকণ্ঠে হযরতকে বললো, হযরত! আমি আমার নামাযের ব্যাপারে খুব অস্থিরতাবোধ করছি। কারণ, যখন নামায পড়ি, তখন বিচিত্র ভাবনা আমাকে কাবু করে ফেলে। কিছুক্ষণ এটা ভাবি তো কিছুক্ষণ ওটা ভাবি। তাই এতো নামায হয় না। বরং এতো শুধু কপাল ঠেকানো হয়। তাই হযরত আমি খুব পেরেশান আছি। আমাকে এ থেকে নিষ্কৃতির পথ বলে দিন। হযরত বললেন, তুমি নামাযের মধ্যে যে সিজদা কর, সে সিজদা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সে বললো, এটা তো খুব অপবিত্র সিজদা। কারণ, সিজদা করছি আর নানা অপবিত্র চিন্তায় ডুবে আছি। সিজদা আর কামনা একাকার হয়ে যায়। হযরত বললেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে এ অপবিত্র সিজদা না করা উচিত। এক কাজ করো, এ অপবিত্র সিজদাটা আমাকেই কর। কারণ, আল্লাহ তো সুমহান ও পবিত্র। যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তাঁর জন্য সিজদা করতে হবে তাঁরই মনমতো। নাপাক সিজদা তাঁকে না করাই ভালো। কাজেই সিজদাটা আমাকেই কর। একথা শুনে লোকটি বলে উঠলো, আসতাগফিরুল্লাহ্! হযরত! আপনি এ কেমন কথা বলছেন! আপনাকে সিজদা! এও কি সম্ভব? হযরত উত্তর দিলেন, ব্যস! এতেই বোঝা গেলো, সিজদাটা অন্য কারো জন্য নয় বরং, আল্লাহরই জন্য। এ কপাল শুধু তাঁকেই দেয়া যায় –অন্য কাউকে নয়। সিজদা আর অপবিত্র ভাবনা যতই একাকার হোক এ সিজদা আল্লাহরই জন্য। কপাল ঝোঁকে তো আল্লাহর সামনেই ঝোঁকে। এর মধ্যে যে অবান্তর ভাবনা আসে, তা যদি হয় অনিচ্ছাকৃত, তাহলো 'ইনশাআল্লাহ্' এতে কিছু যায় আসে না। এটা আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

অসঅসা ও কুমন্ত্রণার মাঝেও হেকমত রয়েছে

দেখুন, যদি আমাদের নামায হতো নিরঙ্কুশ ও পবিত্র, যাবতীয় ভাবনা ও অসঅসা থেকে মুক্ত, পরিপূর্ণ খুশু-খুযুসমৃদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ভাবনাই

যদি আমাদের নামাযে না আসতো, এ মহান দৌলত যদি আমরা পেয়ে যেতাম, তাহলে অহংকার ও অহমিকার মতো আপদগুলোতে না জানি কতটা আমরা ডুবে থাকতাম। প্রবাদ যে আছে صَلَّى الْحَا ئِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَالْوَحْيَ এক তাঁতী দু'রাকাত নামায পড়ে অহীর অপেক্ষায় বসে গেলো এ অবস্থাটা আমাদেরও হতো। মাহদী, মসীহ, নবী টাইপের কিছু একটা দাবী করে বসতাম। আসলে আল্লাহ তা'আলা পাত্র বুঝে দান করেন। তাই এসব অসঅসা ও কুমন্ত্রণা আসাটাও আমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

নেকী ও গুনাহের ইচ্ছাতেও রয়েছে পুরস্কার

যা হোক, আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হলো, অন্তরের ইচ্ছার জন্য আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার রহমতই অন্যরকম। তাঁর নীতি হলো শুধু গুনাহের ইচ্ছা করলে এর জন্য তিনি তিরস্কার করেন না। কেউ একজন ইচ্ছা করলো যে, একটু গুনাহ করি। এর জন্য আল্লাহ তাকে অভিযোগের কাঠগোড়ায় দাঁড় করান না। হ্যাঁ, গুনাহ করার জন্য অন্তর উসখুস করলে, অন্তরে বারবার গুনাহ করার ইচ্ছা জাগলে এবং একে সে দমিয়ে রাখলে এর জন্যও তিনি পুরস্কার দান করবেন। গুনাহ না করার জন্য এবং নফ্সকে শাস্তি দেয়ার জন্যই এ পুরস্কার। অপর দিকে নেকীর ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো, নেকীর ইচ্ছা করলেই হলো, তিনি এ ইচ্ছারও পুরস্কার দেন। যেমন এক ব্যক্তির মনে জাগলো যে, আমার হাতে সম্পদ এলে সেখান থেকে আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবো। তাহলে সে শুধু নিয়তের কারণে সাওয়াব পেয়ে যায়। কিংবা এক ব্যক্তি জিহাদের নিয়ত করলো। সে মনে মনে ভাবলো, কখনও যদি জিহাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি জিহাদ করবো। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবো, তাহলে তাকেও আল্লাহ তা'আলা শহীদদের কাতারে শামিল করে নেন। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস দেখুন। তিনি বলেছেন–

مَنْ سَئَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ قَلْبِهِ كُتِبَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ –

যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে শহীদ হওয়ার কামনা রাখে, আল্লাহ তাঁকে শহীদদের কাতারভুক্ত করে নেন। এমনকি সে আপন বিছানায় মারা গেলেও।

বিচিত্র ভাবনার চমৎকার উপমা

সারকথা হলো, গুনাহ করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া যাবে না। এ ছাড়া একটু আধটু গুনাহ করার জন্য মন আকুপাকু করা দোষের কিছু নয়। এর জন্য নেক কাজ থেকে দমে গেলে চলবে না। হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, অন্তরে বিচিত্র ভাবনার উদয় হওয়া আর ওই ভাবনার ডাকে সাড়া দেয়া এক কথা নয়। এর উদাহরণ হলো এ রকম যে, এক ব্যক্তিকে বাদশাহ নিমন্ত্রণ জানালো। সে বাদশাহর দরবার অভিমুখে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো বিভিন্ন লোকজন। কেউ তাঁকে ঘিরে ধরে বললো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কেউ বললো, একটু দাঁড়ান আপনার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আছে। কেউ তার হাত ধরে বললো, আরে রাখেন বাদশাহর নিমন্ত্রণ! বসুন, একটু গল্প করি। কিন্তু সে ব্যক্তি ভাবলো, এ তো বাদশাহর নিমন্ত্রণ। এ নিমন্ত্রণ মিস করা যাবে না। এরা তো দেখি পাগল। আমাকে বাদশাহর কাছে যেতে দিচ্ছে না। আমার সৌভাগ্যের পথে তো এরা বাঁধা হয়ে আছে। কিন্তু এদের কথা তো শোনা যাবে না। আমাকে যেতেই হবে বাদশাহর দরবারে। এ সম্মানের মূল্যায়ন করতে হবে। এই ভেবে সে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। হনহন করে সে পথ চলতে লাগলো। অন্তরের এসব কুমন্ত্রণাও ঠিক এরকম। তাই এগুলোর দিকে মন দেয়া যাবে না। বরং এগুলোকে পরওয়া না করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতেই হবে।

খেয়াল আনা গুনাহ

এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, হযরত! আমি খুব বিড়ম্বনায় ভুগছি। যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন রাজ্যের জল্পনা-কল্পনা আমার মনে শুধু আসতেই থাকে। তাই আমার নামায হচ্ছে কিনা এ ভয়ে আমি অস্থির। হযরত তাঁকে উত্তর দিলেন, জল্পনা-কল্পনা আসা গুনাহ নয় –আনা গুনাহ। অর্থাৎ জেনে-শুনে অনর্থক জল্পনা-কল্পনা করা যাবে না। এতে গুনাহ হবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে এলে কোনো গুনাহ হবে না।

চিকিৎসা

কুমন্ত্রণা ও অসঅসার চিকিৎসা হলো, একে গুরুত্ব দিবে না। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সে নিজে-নিজে চলে যাবে। শুধু নিজের কাজ করতে থাকবে।

নামাযের সময় শুধু নামাযের দিকেই লক্ষ্য রাখবে। হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, যেহেতু নামাযই কাম্য, সুতরাং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবনার কারণে একে গুরুত্বহীন মনে করো না।

অনেক নামাযী অভিযোগের সুরে বলে থাকে, নামাযে মজা পাই না। এর উত্তর হলো, মজার জন্য নামায ফরয করা হয়নি। বরং এটা আল্লাহর ইবাদত। মজা পেলে ভালো কথা। কিন্তু না পেলে নামাযের ফযীলত একবিন্দুও কমবে না। সুন্নাতমতে নামায পড়লে সারা জীবন মজা না পেলেও কোনো ক্ষতি হবে না। মজা এলেও নামায পড়বে আর না এলেও পড়বে। এমনকি কষ্ট হলেও নামায পড়বে। বরং কষ্ট মনে হলেও নামায পড়লে সাওয়াব পাবে দ্বিগুণ।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনেও নামাযে মজা না পাওয়া সত্ত্বেও নামায পড়ে 'ইনশাআল্লাহ্' সে সাওয়াব পাবে। সে দু'টি কারণে সাওয়াব পাবে। প্রথমত, নামায পড়ার কারণে। দ্বিতীয়ত, নামাযে মজা পেলে তার অন্তরে এ খটকা জাগতো যে, নফসের জন্য নামায পড়ছি। এখন মজা না পাওয়ার কারণে এ খটকাও দূর হয়ে গেলো।

অসঅসার সংজ্ঞা

নিজে-নিজে যে ভাবনা ও কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয় সেটাই অসঅসা। কিন্তু নিজে কল্পনা করে যে কুমন্ত্রণা আনা হয়, তা অসঅসা নয় বরং এটা স্বয়ং একটি বদ-অভ্যাস। এ বদ-অভ্যাসের কারণে অনেক সময় মানুষ গুনাহ করে ফেলে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা

যে ভাবনা মানুষ ইচ্ছা করে আনে, তা থেকে বাঁচার পদ্ধতি হলো, এ ধরনের ভাবনা আসার সঙ্গে কোনো একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে হবে। কারণ, এ অসঅসা তো আর লাঠি পেটা করে দূর করা যায় না। বরং অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে দেখবে এমনিতেই এটি চলে গেছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা বেশী-বেশী করে পড়বে। দু'আটি এই–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِىْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هَمَّتِىْ وَهَوَاىَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى –

হে আল্লাহ! আমার অন্তরের উদিত ভাবনাগুলো আপনার ভয় ও স্মরণে পরিণত করে দিন। এবং আমার মর্জি ও কামনাগুলো আপনার পছন্দমাফিক করে দিন।

মানুষ হলো ভাবুক। একটা না একটা ভাববেই। হাতে কাজ চলে; কিন্তু হৃদয় ও দেমাগ থাকে অন্য ভাবনায়। এ ভাবনাগুলো যদি হয় আল্লাহর ভয় ও স্মরণস্নাত, তাহলে তার জীবন কতই-না সুন্দর হয়। এজন্যই এ দু'আটি চমৎকার। এটি আমাদেরকে শিখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

"এ গুনাহটা আসলে কী? এর পরিণতিই বা কী? আসলে গুনাহ অর্থ হলো অবাধ্যতা। যেমন আপনার গুরুজন আপনাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিলেন। বললেন, এ কাজটি তুমি এভাবে কর। কিংবা বললেন, অমুক কাজটি তুমি করোনা। এখন আপনি তাঁর কথা অমান্য করে বসলেন। করণীয় কাজটি করলেন না। বর্জনীয় কাজটি ছাড়লেন না। তাহলে আপনাকে বলা হবে আপনি আপনার গুরুজনের অবাধ্যতা করেছেন। ঠিক এ বিষয়টিই যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে ঘটে, তা হলে তাকে গুনাহ বলা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অবাধ্যতার পরিণতি খুবই ভয়াবহ এবং এর নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন।"

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ لَهٗ رَجُلٌ : رَجُلٌ قَلِيْلُ الْعَمَلِ قَلِيْلُ الذُّنُوْبِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ اَوْرَجُلٌ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الذُّنُوْبِ قَالَ لَا اَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ —

(كتاب الزهد لابن مبارك ، باب ماجاء في تخويف عواقب الذنوب)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)। রাসূল (সা.)-এর ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। এত অল্প বয়সে আল্লাহ তাঁকে অনেক মর্যাদা দান করেছিলেন। এর মূল কারণ হলো, রাসূল (সা.) তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

হে আল্লাহ! আপনি তাকে কুরআনের জ্ঞান দান করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করুন।

যদিও রাসূলুল্লাহ (সা.) ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর ছিলো; কিন্তু এ কিশোর বয়সেই তাঁর অন্তরে পরিপূর্ণভাবে অংকিত ছিলো রাসূল (সা.) এর যুগের কথা ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এরপরেও রাসূল (সা.)-এর ইনতেকালের পর তিনি ভাবলেন, যদিও আল্লাহর রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন; কিন্তু বড় বড় অনেক সাহাবী তো জীবিত আছেন। তাই আমি ইচ্ছা করলেই তাঁদের কাছ থেকে ইল্‌ম শিখতে পারি।

যে ভাবনা সে কাজ। তিনি যথারীতি নেমে পড়লেন ইল্‌ম অর্জনের এ ময়দানে। বড় বড় সাহাবার কাছে যেতেন। দূর-দূরান্তে সফর করতেন। এভাবে তিনি ইল্‌মের বিশাল ভাণ্ডার আয়ত্ব করে ফেললেন। অবশেষে এ ময়দানে তিনি এত সুউচ্চ মর্যাদায় পৌছে যান যে, আজও জগতে তিনি ইমামুল মুফাস্‌সিরীন তথা তাফসীর বিশারদদের মহান নেতা নামে খ্যাত। এসবই রাসূল (সা.)-এর দু'আর ফসল। আজও তাঁর কথাকেই কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আজ যে বাণীটি পাঠ করলাম এটা তাঁরই বাণী।

পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

বাণীটি এই– তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, বলুন তো, এক ব্যক্তি আমল খুবই কম করে। অর্থাৎ– নফল ইবাদত-বন্দেগী তেমন একটা করে না। ফরয-ওয়াজিব ঠিকমতই আদায় করে। এরপর নফল নামায, যিকির, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি খুব একটা করে না। এমন ব্যক্তিকে আপনি পছন্দ করেন, না ঐ ব্যক্তিকে অধিক পছন্দ করেন, যার নফল ইবাদত অনেক, আবার গুনাহ অনেক। অর্থাৎ সে নফল নামায-তাহাজ্জুদ, ইশরাক-আওয়াবীন সবই নিয়মিত আদায় করে। যিক্‌র, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি ও তার নিয়মিত আমল। সেইসঙ্গে গুনাহ ছাড়ে না। এই দুজনের মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে উত্তম কে? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমার দৃষ্টিতে গুনাহ বর্জনের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। অর্থাৎ গুনাহ বর্জনই সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এর তুলনা অন্য কোনো আমল দ্বারা হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহ বর্জনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তাহলে এটা অসংখ্য নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

মূল বিষয় হলো গুনাহমুক্ত থাকা

এ হাদীসের মমার্থ হলো, নফল ইবাদতসমূহের গুরুত্ব ও মর্যাদা যথাস্থানে অবশ্যই আছে। কিন্তু নফল ইবাদতের উপর ভরসা করে গুনাহের মাঝে ডুবে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। মূল বিষয়টি হলো, গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের জন্য সচেষ্ট থাকা। গুনাহমুক্ত থাকার পর যদি কারো পক্ষে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের সুযোগ না হয়, তাহলে তা কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, নফল ইবাদত ও গুনাহ সমানতালে চলে, তাহলে তার মুক্তির কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ, তার এ জীবনাচার খুবই ভয়ঙ্কর।

গুনাহ বর্জনের চিন্তা নেই

আজকাল আমাদের সমাজে মানুষ এ নিয়ে খুব কমই চিন্তা করে। যদি কখনও আল্লাহ তা'আলা কাউকে দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করেন, কারো মনের মাঝে যদি ঈমানী জযবা জেগে উঠে, তাহলে সে ভাবে, আমাকে অনেক ইবাদত করতে হবে। তারপর কোনো আলেমের কাছে গিয়ে বলে, আমাকে কিছু ওযীফা দিন। কিছু আমল ও যিকিরের কথা বাতলে দিন। কোন-কোন সময় কী কী নফল ইবাদত করতে পারি, তাও বলে দিন। তারপর রাত-দিন এসব নফল ইবাদতের মাঝে ডুবে থাকে। কিন্তু একবারও সে ভেবে দেখে না, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতটি গুনাহ আমি করলাম। আজকের দিনটাতে আল্লাহর কটি বিধান আমি অমান্য করেছি। অনেক শিক্ষিত ধার্মিক লোককেও দেখেছি, খুবই গুরুত্বসহ মসজিদের প্রথম কাতারে শামিল হন। সহজে জামাত কাযা হয় না। যিকির, তেলাওয়াত ও নফল ইবাদতও রীতিমত আদায় করেন। কিন্তু তার ঘর যে গুনাহের এক মুক্ত বাজার, এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ঘরকে শোধরাবার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেন না। বাজারে গেলে হালাল-হারামের ধার ধারেন না। কথা বলার আগেই থৈ থৈ করে উঠে পরনিন্দার ফুলঝুড়ি। মিথ্যা ছাড়ার কথা চিন্তাও করেন না। তার ঘর যে পাপাচার ও অবৈধতার আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে, এটা নিভানোর কথা মাথায় আসে না। ঘরে নিয়মিত উলঙ্গপনা চলছে, ফ্লিম দেখা হচ্ছে, গান-বাজনা চলছে–এসব নিয়ে তার একটুও মাথাব্যথা নেই। তবে যিকির-ওযীফার প্রতি গভীর আকর্ষণ তার। অথচ এসব গুনাহই একজন মানুষের ধ্বংসের কারণ। প্রথমেই ভাবা উচিত, এ গুনাহগুলো কিভাবে নিভানো যায়।

নফল ইবাদত ও গুনাহের চমৎকার উপমা

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য একটি উপমা বুঝে নিন– এই যে মানুষ নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি করে এগুলো হলো টনিকের মত, যার দ্বারা শরীরের শক্তি বাড়ে। শক্তিবর্ধক টনিক মানুষ শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। আর গুনাহ হলো বিষের মত। এখন যদি কোনো ব্যক্তি প্রাণখুলে টনিক পান করে এবং সেই সঙ্গে বিষও পান করে, তাহলে পরিণতিতে দেখা যাবে টনিক তার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। তবে বিষ অবশ্যই তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এমনকি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি শক্তিবর্ধক টনিক পান করে না, বিষও পান করে না। শুধু নিয়মিত ডাল-ভাত খায় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ এড়িয়ে চলে, তাহলে এ ব্যক্তি সুস্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। যদিও সে টনিক পান করে না। গুনাহের সঙ্গে নফল ইবাদতের উপমাটাও ঠিক এমন। সুতরাং প্রথমে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, আমাদের জীবনটা গুনাহমুক্ত হলো কিনা? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকে গুনাহ নামক বিষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদত নামক এ টনিক আমার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না।

সংশোধন-প্রত্যাশীদের প্রথম কর্তব্য

আজকাল তো ব্যাপার অনেকটা এরকম– কোনো ব্যক্তি পীরের কাছে বাই'আত গ্রহণ করলে এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুললে পীর সাহেব তাকে সঙ্গে-সঙ্গে শুনিয়ে দেন তোমাকে এই-এই আমল পালন করতে হবে, এই পরিমাণে যিকির করতে হবে এবং এই পরিমাণে তাসবীহ পড়তে হবে। কিন্তু উম্মাহর আধ্যাত্মিক চিকিৎসক মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর নিয়ম ছিলো, তাঁর কাছে যখন কোনো ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসতো, তিনি তাকে যিকির-তাসবীহ ইত্যাদির কথা বলতেন না, বরং সর্বপ্রথম তাকে বলতেন, নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে হবে। এর জন্য প্রথম কাজ হলো, যথাযথভাবে তাওবা করা। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির পথে মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা। আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দু'আ করা, হে আল্লাহ! আমার অতীতের সকল গুনাহ দয়া করে মাফ করে দিন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনো গুনাহ করবো না। তারপর সর্বদাই নিজেকে পাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। পরিচিত কিছু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই

এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বরং বড়-ছোট সব গুনাহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (سورة الأنعام ١٢٠)

'তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ ছেড়ে দাও।'

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ –

(سورة الأنعام ١٢٠)

'নিশ্চয় যারা পাপ করে, আখেরাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে'। –(সূরা আল-আন'আম : ১২০)

সব ধরনের গুনাহ বর্জন কর

সুতরাং কোনো গুনাহকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। চাই তা প্রকাশ্য গুনাহ হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। হাতেগোনা কিছু গুনাহ বর্জন করে অবশিষ্ট গুনাহগুলো করতে থাকা তাওবার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন- মজলিসে বসলেই পরসমালোচনার পসরা নিয়ে বসা, মানুষের অন্তরে ব্যথা দেয়া, অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, অহংকার, সম্পদপ্রীতি, পদপ্রীতি এবং পার্থিব জগতের প্রতি গভীর মোহ এসবই গুনাহ। গুনাহমুক্ত জীবন কাটাতে চাইলে ছোট-বড় সব গুনাহই বর্জন করতে হবে।

স্ত্রী-সন্তানদেরকেও বাঁচাতে হবে

আরেকটি কথা আপনাদের কাছে আরজ করতে চাই। তাহলো, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। কেউ যদি ভাবে, আমি গুনাহ করবো না; আমার স্ত্রী-সন্তান করুক তাতে আমার কী আসে যায়। মনে রাখবেন, এভাবে কখনও নিজেকে মুক্ত রাখা যায় না। নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র তখনই রাখতে পারবে, যখন নিজের পরিবেশকে, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে তুলতে সক্ষম হবে। নিজে সংশোধন-প্রত্যাশী আর স্ত্রী যদি হয় গুনাহের পথচারী, তাহলে এ স্ত্রী একদা তোমাকে গুনাহে ডুবিয়ে মারবে। এজন্যই নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা যতটা প্রয়োজন, স্ত্রী-সন্তানদেরকেও গুনাহমুক্ত করে তোলা ঠিক ততটা প্রয়োজন।

নারীর ভূমিকা ও তার গুরুত্ব

এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো নারীর অন্তরে এ পবিত্র ভাবনা সৃষ্টি করা যায় যে, আমি সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টিমাফিক নিজের জীবনটাকে চালাবো, তাহলে তার ঘরের পরিবেশ অনায়াসে বদলে যাবে। কারণ, নারী হলো ঘরের ভিত্তি। তাই কোনো নারীর মাঝে এ চেতনাবোধ তৈরি হলে সহজেই সেই ঘর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। এরাই আলোকিত নারী। কিন্তু কোনো নারীর মাঝে যদি পর্দার গুরুত্ব না থাকে, উলঙ্গপনার প্রতি যদি তার আকর্ষণ থাকে, অনর্থক কাজ-কর্মের প্রতি যদি তার আসক্তি থাকে, তাহলে সে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে নিঃসন্দেহে। এজন্য পরিবেশের সংস্কার ও শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গুনাহ কী?

সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, এ গুনাহটা আসলে কী? তার পরিণতিই-বা কী? গুনাহ অর্থ হলো অবাধ্যতা। যেমন– আপনার গুরুজন আপনাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিলেন। বললেন, এ কাজটি তুমি এভাবে কর। কিংবা বললেন, তুমি অমুক কাজটি করো না। এখন আপনি তাঁর কথা অমান্য করলেন। করণীয় কাজটি করলেন না আর বর্জনীয় কাজটি ছাড়লেন না। তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি আপনার গুরুজনের অবাধ্যতা করেছেন। এ বিষয়টিই যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকেই বলা হয় গুনাহ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অবাধ্যতার পরিণতি খুবই ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী, যা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে নেহায়েত কঠিন।

গুনাহের প্রথম ক্ষতি : অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া

গুনাহের প্রথম ক্ষতি হলো, অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। যে মহান প্রভু মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যার অফুরন্ত নেয়ামতে মানুষ সর্বদা আকণ্ঠ ডুবে আছে, মানুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত যার নেয়ামত বহন করে চলেছে, তার সেই নেয়ামতসমূহের মধ্য থেকে মাত্র একটি নেয়ামতের কথা ভাবলে উপলব্ধি করা যাবে এর মূল্য ও গুরুত্ব কত। শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ নিয়ে ভাবলেই এর তাৎপর্য অনুমান করা সহজ হবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু এসব নেয়ামত কোনো বিনিময় ছাড়াই পেয়েছে, তাই তার অন্তরে এর প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্যের অনুভূতি নেই। আল্লাহ না করুন, যদি শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে,

তখনই আমরা টের পাই এটা কত মূল্যবান নেয়ামত এবং এর ক্ষতিটা কতটা ভয়াবহ। চোখ, কান, জিহ্বা এগুলো কত বড় নেয়ামত। সুস্থতা? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে খানাপিনা আমরা ভোগ করি– সেগুলো? এসবের মূল্য পরিমাপ করা কি সম্ভব? কিন্তু যে মহান স্রষ্টা নেয়ামতের এ সাগরে আমাদেরকে ডুবিয়ে রেখেছেন, তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা শুধু কয়েকটি কথা মেনে চলবে। কয়েকটি কাজ করবে আর কয়েকটি কাজ থেকে বিরত থাকবে। অথচ এ কয়েকটি আদেশ-নিষেধ আমরা মানতে পারি না– এর মূল কারণ হলো, আমরা সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখি না। এ মহান দাতার কৃতজ্ঞতার কথা আমরা ভাবি না। এটাই মূলত গুনাহের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

দ্বিতীয় ক্ষতি : অন্তরে জং ধরে যায়

গুনাহের দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়। এ বিন্দুর মর্মার্থ কী– তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তারপর সে যখন দ্বিতীয়বার গুনাহ্ করে, তখন অন্তরে আরেকটি বিন্দু যোগ হয়। তৃতীয়বারের গুনাহের সঙ্গে যোগ হয় আরেকটি। এরই মধ্যে যদি সে তাওবা করে, তখন গুনাহের এ বিন্দুগুলো বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু যদি সে তাওবা না করে বরং গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, তাহলে গুনাহের এ বিন্দুগুলো দ্বারা এক সময় তার গোটা অন্তর ঢেকে যায়। অবশেষে এগুলো জং-এর রূপ ধারণ করে। অন্তরটা তখন হয়ে যায় জং-আচ্ছাদিত অন্তর। তখন তার অন্তরে আর সত্য কথা মানার যোগ্যতা থাকে না। ধীরে-ধীরে অন্তর এতটা গাফেল ও নির্বোধ হয়ে পড়ে যে, তাতে গুনাহের অনুভূতিটাও অবশিষ্ট থাকে না। গুনাহের ক্ষতি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতাও তার অন্তরে থাকে না, যেন এ মানুষটা একেবারে বিবেকশূন্য হয়ে পড়ে।

গুনাহ্ সম্পর্কে মুমিন ও ফাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি

এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে মুমিন বান্দা এখন পর্যন্ত গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়েনি, সে গুনাহকে মাথার উপর ঝুলন্ত একটি বিশাল পাহাড়ের মত মনে করে। আর ফাসিক ব্যক্তি গুনাহ্‌কে এতটা তুচ্ছ মনে করে, যেন নাকের ডগায় একটি মাছি বসলো আর সে হাতের ইশারায় তা তাড়িয়ে দিলো। অর্থাৎ গুনাহকে সে খুবই তুচ্ছ মনে করে। গুনাহ করার কারণে নিজের ভেতরে কোনো অনুশোচনাবোধ জাগে না। পক্ষান্তরে

মুমিন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের বরকতে সমৃদ্ধ করেছেন, সে গুনাহকে একটি বিশাল পাহাড় মনে করে। ভুলবশত যদি কখনও গুনাহের শিকার হয়ে পড়ে, তখন তার কাছে মনে হয় তার মাথার উপর যেন একটি বিশাল পাহাড় ভেঙে পড়েছে। ফলে সে ভেতর থেকে অস্থিরতা ও অনুশোচনা বোধ করে।

নেকী ছুটে গেলে মুমিনের অবস্থা যা হয়

গুনাহ তো অনেক দূরের কথা, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো নেক কাজ হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে মুমিন বান্দার অস্থিরতার কোনো সীমা থাকে না। সে অস্থির হয়ে যায় যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি কাজটি করতে পারলাম না। এ সম্পর্কে মাওলানা রুমী (রহ.) বলেছেন–

بر دل سالک ہزاراں غم بود ✪ گر ز باغ دل خلالے کم بود

সালিক তথা কল্যাণ পথের যাত্রীর অন্তরে যদি বাগানের একটি ক্ষুদ্র তৃণও কম পড়ে যায় অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে যদি একটি ক্ষুদ্র নেক কাজ করতে না পারে, তখন তার হৃদয়ে হাজার পাহাড়ের বোঝা ভেঙে পড়ে।

এ যদি হয় ক্ষুদ্র একটি নেক কাজ ছেড়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া, তাহলে গুনাহ করে ফেললে তাদের অবস্থা কেমন হয়, তা সহজেই বোধগম্য। যার অন্তর গুনাহের কালো বিন্দু দ্বারা আচ্ছন্ন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার মত অবস্থা থেকে রক্ষা করুন, যার কাছে গুনাহ কোনো বিষয়ই নয়। গুনাহের কারণে যার অন্তর সামান্যতম ব্যথিতও হয় না, তার অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

সারকথা হলো, পাপের অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো– পাপ মানুষকে গাফেল ও বিবেকশূন্য করে ফেলে।

তৃতীয় ক্ষতি : অন্ধকার আর অন্ধকার

আমরা যেহেতু গুনাহের পরিবেশে থাকতে-থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই গুনাহের অন্ধকার ও অনিষ্টতার অনুভূতিও আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। নচেৎ প্রতিটি গুনাহই অন্ধকার ও ক্ষতিকর। যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে পরিপূর্ণ ঈমান দান করেন, তাহলে তার পক্ষে সম্ভব নয় সেই অন্ধকারকে সহ্য করা। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা তাঁর

মুখেই শুনুন। তিনি বলেন, একবার ভুলক্রমে কোনো কারণে হারাম উপার্জনের একটি লোকমা আমার পেটের ভেতর চলে গিয়েছিলো। এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করেছিল। তার মন রক্ষার্থে আমি তার বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, তার উপার্জন হালাল নয়। আমি দীর্ঘ দুই মাস এ হারাম লোকমাটির অন্ধকার আমার অন্তরে অনুভব করেছি। দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত আমার অন্তরে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হতো। এটা মূলত গুনাহের নেতিবাচক প্রভাব ও তার অন্ধকার।

গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার উপমা

গুনাহ আমরাও করি। কিন্তু তার কোনো অন্ধকার আমাদের অন্তরে অনুভূত হয় না। কারণ, আমরা গুনাহতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর উপমা হলো– একটি দুর্গন্ধময় ঘর। ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ময়লা চুইয়ে বের হচ্ছে। ঘরময় ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখন বাইরে থেকে কেউ এলে এর উৎকট গন্ধে অস্থির হয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে। অথচ দেখা যায় এরই ভেতর একজন লোক দিব্যি বসবাস করছে। এ উৎকট গন্ধময় আবর্জনার মাঝেই সে থাকে। এর ভেতর সে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। দুর্গন্ধের কোনো অনুভূতি তার মধ্যে নেই। কারণ, দুর্গন্ধ তার সয়ে গেছে। তার কাছে সুগন্ধি আর দুর্গন্ধের কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই সে এ দুর্গন্ধময় জগতের মধ্যে রীতিমত বাস করে যাচ্ছে। যদি কেউ তাকে বলে, এত দুর্গন্ধের ভেতর তুমি থাক কিভাবে? তাহলে সে হয়ত রাগ হয়ে একথাও বলতে পারে, তুমি পাগল নাকি? কোথায় দেখলে দুর্গন্ধ? আমি তো খুব আরামেই আছি। এর কারণ, সে দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যাকে এ দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উপরন্তু তাকে সুগন্ধিময় পরিবেশে রেখেছেন, তার অবস্থা হবে এই দূর থেকে এর উৎকট গন্ধ নাকে লাগতেই তার মাথা ঘুরে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ যাকে ঈমান দান করেছেন, যার অন্তর আল্লাহর ভয় দ্বারা সমৃদ্ধ, তার কাছে গুনাহকে অন্ধকার মনে হয়। তিনি হৃদয় দিয়ে গুনাহের অন্ধকার ও কালো ছায়া অনুভব করেন। মোটকথা, গুনাহের তৃতীয় ক্ষতি হলো, গুনাহের কারণে অন্তর অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। ফলে গুনাহের অন্ধকার সে উপলব্ধি করতে পারে না।

চতুর্থ ক্ষতি : বিবেক লোপ পায়

গুনাহের চতুর্থ ক্ষতি হলো, মানুষ যখন অনবরত গুনাহ করতে থাকে, তখন তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। তার চিন্তা-চেতনা তখন ভুল পথে পরিচালিত

হয়। ভালো কথা তখন তার কাছে মন্দ মনে হয় আর মন্দ কথা মনে হয় ভালো। ভালো কথা বিনয়ের সঙ্গে বললেও তার মাথায় ঢোকে না। এ মর্মেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে বিনা কারণে পথভ্রষ্ট করেন না। যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এর পরিণতিতেই সে পথভ্রষ্টতার শিকার হয়। তারপর সত্য কথা তার মাথায় ধরে না।

গুনাহ শয়তানের বিবেককে বিকৃত করে দিয়েছিলো

ইবলিসের বিষয়টি একটু চিন্তা করুন। ইবলিস গুনাহের আবিষ্কারক। এ জগতে সে প্রধান ও প্রথম গুরু। কারণ, সে-ই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম গুনাহের সূচনা করে। শুধু নিজে গুনাহ করেই সে থেমে থাকেনি, বরং মহান আল্লাহর প্রথম ও বিশিষ্ট নবী হযরত আদম (আ.)-কেও পদস্খলিত করার চেষ্টা করেছিলো। গুনাহের ফলে তার বিবেক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আ.) কে সিজদা করতে, তখন সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে নিতে পারেনি। বরং উল্টো যুক্তির ঘোড়া দাবড়িয়ে বলেছিলো, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। দৃশ্যত তার এ যুক্তিটা বেশ চমৎকার। এতে প্রমাণিত হয়, মাটি নয় বরং আগুনই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার বিবেকে একথা জাগেনি যে, যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো মাটিও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সেই স্রষ্টা যখন নির্দেশ দিয়েছেন আগুন যেন মাটিকে সিজদা করে, তখন কে শ্রেষ্ঠ আর কে অধম এই চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তার মাথায় এই কথাটা আসেনি, যে কারণে তাকে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। আর আল্লাহর দরবারে তাওবার পথ তো সর্বদাই উন্মুক্ত। মানুষের জন্যও, শয়তানের জন্যও। গুনাহ করার পর সে যদি নিজের বিবেককে সঠিকভাবে পরিচালিত করে আল্লাহর কাছে তাওবা করতো, তাহলে সেও ক্ষমা পেতে পারতো। কিন্তু সে আজ পর্যন্তও আল্লাহর কথা মানতে প্রস্তুত নয়।

শয়তানের তাওবা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ঘটনাটি আমি আমার শাইখের কাছে শুনেছি। দৃশ্যত যদিও এটি ইসরাঈলী বর্ণনানির্ভর, কিন্তু খুবই শিক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি হলো, একবার মূসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে তুর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পথে শয়তানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। শয়তান বললো, আপনি তো আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন

কথোপকথনের জন্য, আমার একটি ছোট্ট কাজ করে দিন। মূসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ? শয়তান বললো, আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়ে আমি এখনও ঘুরছি। এখন তো মুক্তির কোনো উপায় পাচ্ছি না। আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন যেন মুক্তির একটা উপায় তিনি বলে দেন। আমি যেন এ অভিশপ্ত জীবন থেকে রেহাই পেতে পারি।

হযরত মূসা (আ.) বললেন, বেশ ভালো কথা। তারপর তিনি তুর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু শয়তানের প্রস্তাবটা বেমালুম ভুলে গেলেন। আলাপ শেষে যখন তিনি ফেরার জন্য পথ ধরলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে বললেন, তোমার মাধ্যমে কি কেউ কোনো পয়গাম পাঠিয়েছিলো? মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! হ্যাঁ, পাঠিয়েছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। পথে ইবলিসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখলাম, সে খুব অস্থির। মুক্তির পথ খুঁজছে। আমাকে বলেছিলো, আপনার কাছে যেন আমি একটু সুপারিশ করি, যেন আপনি তাকে মুক্তির একটা পথ বাতলে দেন। সে ভালো হতে চাচ্ছে। হে আল্লাহ! আপনি তো করুণার আধার। আপনি সকলকেই ক্ষমা করেন। সে যখন তাওবা করতে চাচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, তার তাওবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে এটা আমি কখন বললাম। আমি তো সর্বদাই ক্ষমা করতে প্রস্তুত। তাকে জানিয়ে দাও, তোমার তাওবা কবুল হবে। তার তাওবার পদ্ধতি হলো, আমি তো তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আদম (আ.)-কে সিজদা করতে। সে আমার কথা মানেনি। এখন বিষয়টাকে আরো সহজ করে দিচ্ছি। আদম তো বেঁচে নেই। তাই তাকে আর সিজদা করতে হবে না। তবে তার কবরে গিয়ে সিজদা করলেই হবে। আমি তাকে মাফ করে দেবো।

মূসা (আ.) বললেন, এটা তো একেবারে সহজ বিষয়। অবশেষে মূসা (আ.) শয়তানকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। বললেন, শোনো, বিষয়টা খুবই সহজ হয়ে গেলো। আদমের কবরে যাও। সেখানে সিজদা কর। এটাই তোমার তাওবা। আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন।

শয়তান সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলো, বাহ! যাকে আমি জীবিত থাকাকালীন সিজদা করিনি, এখন মরার পর তার কবরে সিজদা করবো? না, কখনই নয়। এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শয়তান এ উত্তর এজন্য দিয়েছিলো, কারণ, তার বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সারকথা হলো, এটা গুনাহের একটি বৈশিষ্ট্য। গুনাহের কারণে মানুষের বিবেকে পঁচন ধরে যায়। তখন সঠিক কথাটাও তার মাথায় ধরে না।

কারণ জানার অধিকার তোমার নেই

কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় যেসব গুনাহকে হারাম বলা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে যারা ডুবে আছে, তাদেরকে যদি বলা হয়, এটা তো হারাম, জঘন্য গুনাহ এটা, তাহলে দেখা যায়, সঙ্গে-সঙ্গে তারা এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা জানতে চায়। বরং এর বিপরীতে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বলে, এটা হারাম হবে কেন? এটা গুনাহ হবে কেন? এর মধ্যে তো এই উপকার আছে, সেই কল্যাণ আছে। সুতরাং এটাকে হারাম করার কারণ কী? কোন যুক্তিতে এটাকে গুনাহ বলা হলো? এ ধরনের অনর্থক বিতর্ক যারা সৃষ্টি করে, তাদেরকে যদি বলা হয়– বলো তো তুমি কি এ পৃথিবীতে প্রভু হয়ে এসেছ, না বান্দা হয়ে? যদি বান্দা হয়ে এসে থাক, তাহলে তোমার এ প্রশ্নগুলোকে তোমার অধীন কোনো চাকরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। যেমন- বাজার-সদাই করার জন্য তুমি একজন চাকর রেখেছ। তাকে বাজারের একটি তালিকা দিয়ে বললে, এগুলো বাজার থেকে নিয়ে আস। এখন যদি এ চাকর তোমার মুখের উপর প্রশ্ন করে, আচ্ছা! এ সদাইগুলো আমি আনতে যাবো কেন? এখানে পরিমাণ তো বেশি লেখা হয়েছে। কেন এই অপচয়? এবার বলো, এ জাতীয় আপত্তি উত্থাপন করতে থাকলে সে চাকরটাকে তুমি কী করবে? তাকে কি তুমি কান ধরে বের করে দেবে না? নির্ঘাত তুমি এটা করবে।

তুমি তো চাকর নও; বরং বান্দা

একটু ভেবে দেখ, তোমার আট ঘণ্টার চাকর তোমার গোলাম নয়। তুমি তাকে সৃষ্টি করনি। সে তোমার বান্দা নয়। তুমি তার প্রভু নও। বরং সে তোমার একজন বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। এরপরেও তোমার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশের কারণ জানার অধিকার তার নেই। যদি জানতে চায়, তাহলে তুমি তা বরদাশত কর না। অথচ তুমি তো আল্লাহ তা'আলার চাকর নও। গোলামও নও। বরং তুমি তাঁর বান্দা। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তিনিই যখন তোমাকে নির্দেশ দেন অমুক কাজটি কর, তখন তুমি যুক্তির অজুহাত পেশ করে বলে ফেল– অমুক কাজটি কেন করবো? আগে কারণ বল, তারপর করবো। তোমার এ ধরনের আপত্তি তোমার অধীন চাকরের আপত্তির চাইতে কোনো অংশে কম নয়। বরং এর চেয়েও জঘন্য। কেননা, চাকর তোমার চাইতে অধম হলেও সেও তোমার মতই একজন মানুষ। তোমার মতই তারও বিবেক আছে। কিন্তু তোমার বিবেক কি আল্লাহর হুকুমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমতুল্য। তাহলে তুমি কিভাবে আল্লাহর নির্দেশের কারণ খোঁজ কর। কোন সাহসে

বলছো, আগে কারণ বল, তারপর করবো। এটা এজন্যই করছো যে, গুনাহ করতে-করতে তোমার বিবেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের ঘটনা

আমার শাইখ ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। বড়ই শিক্ষামূলক ঘটনা। বিখ্যাত বিজয়ী বাদশাহ সুলতান মাহমদু গজনবী। তার এক প্রিয় গোলাম ছিলো। গোলামটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। নাম ছিলো আয়ায। এ কারণে মানুষ বলাবলি করতো, আয়াজ সুলতানের মুখরা গোলাম। আর সুলতান এ গোলামকে বড়-বড় ব্যক্তির উপরও অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ নিয়ে দরবারে খুব কানাঘুষা চলতো। তাই সুলতান ভাবলেন, এর একটা বিহিত সমাধান হওয়া দরকার। উজির-আমীরের চাইতে এ গোলামকে গুরুত্ব দেয়ার রহস্যটা সকলের সামনে উন্মোচন করে দেয়া প্রয়োজন।

সুলতানের কাছে উপহারস্বরূপ একটি মূল্যবান হীরা এসেছিলো। হীরাটি দেখতেও খুবই চমৎকার ছিলো। সুলতান দরবারে উপবিষ্ট। উপহারটি সুলতানের দরবারে পেশ করা হলো। সকলেই আগ্রহভরে হীরাটি দেখতে লাগলো এবং প্রসংশাও করলো। তারপর সুলতান তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে কাছে ডেকে বললেন, আপনি কি হীরাটি দেখেছেন? কেমন দেখলেন? প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলো, জাহাঁপনা? অতুলনীয়। গোটা পৃথিবীতে এমন হীরা পাওয়া ভার। এবার সুলতান বললেন, হীরাটি মেঝেতে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলুন। এ নির্দেশ শোনামাত্র প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে বললো, জাহাঁপনা! হীরাটা অত্যন্ত দামী। স্মারক হিসাবে এটা আপনার কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এটা আপনি ভাঙতে বলছেন কেন? আমি বিনয়ের সঙ্গে আরজ করছি, এটি ভাঙবেন না। সুলতান বললেন, ঠিক আছে আপনি বসুন। তারপর ডাকলেন এক মন্ত্রীকে। তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। সেও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো। মিনতিঝরা কণ্ঠে বললো, জাহাঁপনা। আপনি এ মূল্যবান সম্পদটি ভাঙতে বলছেন? আমার দরখাস্ত হলো, এটা স্মৃতিস্বরূপ আপনার কাছেই রেখে দিন। এভাবেই তিনি একের পর এক মন্ত্রীকে ডাকলেন। প্রত্যেককে একই নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই একই কথা বললো।

হীরা ভাঙতে পারে, হুকুম ভাঙতে পারে না

সকলের শেষে সুলতান ডাকলেন আয়াযকে। আয়ায উত্তর দিলো, জি জাহাঁপনা! সুলতান বললেন, এ হীরাটি তুলে আছাড় মার। আয়ায সঙ্গে সঙ্গে

হীরাটি হাতে তুলে নিলো এবং মেঝেতে আছাড় মেরে চুরমার করে ফেললো। সুলতান যখন দেখলেন, আয়ায সত্যি-সত্যি হীরাটিকে ভেঙে ফেলেছে, তখন রাগতস্বরে বললেন, তুমি হীরাটি ভেঙে ফেললে? কেন এমন করলে? এত বড়-বড় মন্ত্রীকেও তো আমি ভাঙতে বলেছিলাম, তারা তো ভাঙলো না। তুমি কেন এমন করলে? তোমাকে বললাম আর অমনি তুমি এত মূল্যবান হীরাটাকে টুকুরো-টুকরো করে ফেললে? আয়ায প্রথমে বিনয়াবনত হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো, জাহাঁপনা, ভুল হয়ে গেছে। সুলতান বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাঙলে কেন? আয়ায কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিলো, জাহাঁপনা, আমার মন বলছিলো এটা তো সেরেফ একটা হীরা। এর মূল্য যতই হোক এটা ভাঙার মত বস্তু। কিন্তু আপনার নির্দেশ তো ভাঙার মতো নয়। আমার কাছে আপনার নির্দেশ হীরা ভাঙার চাইতে অধিক দামী। তাই আমি ভেবেছি, নির্দেশ ভাঙার চাইতে হীরাটা ভাঙাটাই আমার জন্য সহজ। এজন্যই আমি এমনটি করেছি।

হুকুমের গোলাম

এবার সুলতান উপস্থিত মন্ত্রীদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, এটাই হলো আপনাদের মধ্যে ও আয়াযের মধ্যে পার্থক্য। আপনাদেরকে যখন কোনো নির্দেশ দেই, তখন তার তাৎপর্য ও কারণ তলব করেন। আর আয়ায হলো হুকুমের গোলাম। তাকে যা বলা হয়, সে তা-ই করে। তার কাছে কারণ ও যুক্তির কোনো মূল্য নেই।

চিন্তা করুন, সুলতান মাহমুদ গজনবীর একটি নির্দেশের মূল্যই-বা কতটুকু? তাঁর বিবেক-বুদ্ধি সীমিত। সীমিত তাঁর মন্ত্রীদের ও আয়াযের বিবেক-বুদ্ধিও। এই মর্যাদার প্রকৃত অধিকারী তো সেই সত্তা, যিনি এ বিশ্ব ভুবনের স্রষ্টা, হীরা ভাঙা যেতে পারে, অন্তর ভাঙা যেতে পারে, ভাঙা যেতে পারে মানুষের আবেগও। স্বপ্ন ও কামনা-বাসনা ও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর হুকুম তো ভাঙা যায় না। এ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁর কোনো হুকুমের মাঝে যুক্তি ও কারণ খোঁজ করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কী হতে পারে। আর এর মূল কারণ হলো গুনাহ। মানুষ যত গুনাহ্ করে, তার বিবেক-বুদ্ধিও ততই কমতে থাকে। সারকথা হলো, গুনাহের কারণে বুদ্ধি-বিবেক হারিয়ে যায়।

গুনাহ্ ছাড়লে নূর পাওয়া যায়

ক্ষণিকের জন্য হলেও গুনাহ বর্জন করে দেখুন, সত্যিকারের তাওবা করে তার ছায়াতলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেখুন। ভেতরে এর বরকত ও নূর অনুভব

করবেন নিঃসন্দেহে। তারপর বিবেক-বুদ্ধির দ্বার খুলে যাবে। সবকিছু সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। এ মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا (سورة الأنفال ٢٩)

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে তিনি তোমাদের অন্তরে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার মাপকাঠি সৃষ্টি করে দিবেন। –(সূরা আল আনফাল : ২৯)

অর্থাৎ– তোমরা যদি গুনাহের পথ ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মাঝে এমন নূর ও যোগ্যতা দান করবেন, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে চিনতে পারবে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি হক আর কোনটি বাতিল। এ যুগের এক বড় সমস্যা হলো, হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যা তালগোল পাকিয়ে গেছে। এর মূল কারণ হলো, গুনাহের কারণে আমাদের অন্তর ও বিবেক-বুদ্ধিতে পঁচন ধরেছে।

পঞ্চম ক্ষতি : অনাবৃষ্টি

গুনাহের আসল সাজা তো আখেরাতের জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এ পৃথিবীতে তার নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আর তাহলো, পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলাও বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন।

ষষ্ঠ ক্ষতি : রোগ-শোক

গুনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি হলো, মানুষের মাঝে যখন পাপাচার, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন রোগ-ব্যাধিতে নিমজ্জিত করেন, যেসবের নাম তাদের পূর্বপুরুষরা কখনও শোনে নি। এটা হাদীসেরই কথা। হাদীসটির আয়নায় আমরা একটু আধুনিক বিশ্বের করুণ ব্যাধি এইডসকে দেখতে পারি। বিশ্বব্যাপী এখন এইডস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অথচ এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগেই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমন অভিনব ব্যাধি থেকে সতর্ক করে গিয়েছেন। প্রত্যেক গুনাহেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এ দুনিয়াতেই ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, যেন মানুষ এর শাস্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিতে পারে।

সপ্তম ক্ষতি : খুন ও রক্তারক্তি

হাদীস শরীফে এসেছে, শেষ যামানায় মানুষ এমন একটা পরিস্থিতির শিকার হবে যে- يَكْثُرُ الْهَرْجُ খুন-খারাবি ব্যাপকহারে ঘটবে। মানুষ খুন হবে; কিন্তু কেন খুন হলো- এটা না নিহত ব্যক্তি জানতে পারবে, না তার উত্তরাধিকারীরা জানতে পারবে।

মানুষ খুনীকে খুঁজে পাবে না এবং খুনের কারণও খুঁজে পাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায়-

لاَيَدْرِى الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ

খুনী জানবে না কেন সে খুন করলো এবং নিহতও জানবে না কেন খুন হলো।

অথচ তখনকার যুগে কেউ খুন হলে তার কারণ জানা থাকতো। সমাজের মানুষের জানা থাকতো, তার সঙ্গে অমুকের শত্রুতা ছিলো। অথচ আজকাল খুন হচ্ছে অহরহ। কিন্তু খুনী ও খুনের কারণ বের করা যাচ্ছে না। বর্তমানের এ চিত্রটা রাসূল (সা.) উক্ত হাদীসের সামনে রাখুন। তারপর মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, হাদীসের বক্তব্য কালের চেহারার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। মনে হবে, যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) দেড় হাজার বছর পূর্বে আজকের পৃথিবীকে সামনে রেখেই কথা বলেছিলেন। মূলত এসবই আমাদের গুনাহের অশুভ ফসল।

খুন-খারাবির একমাত্র সমাধান

বর্তমানে এ ব্যাপক খুন-খারাবি থেকে মুক্তির পথ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেউ পরামর্শ দিচ্ছে, এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান। কেউবা বলছে, প্রয়োজন পারস্পরিক মতবিনিময় ও গোলটেবিল বৈঠক। কিন্তু আমরা এখনও জানি না যে, এই করুণ পরিবেশের জন্য দায়ী আমাদের গুনাহ। গুনাহের দাপাদাপিই আমাদেরকে এ পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কোনো জাতির মধ্যে যখন গুনাহ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার প্রায়শ্চিত্তের চিত্র এভাবেই এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং উচিত ছিলো, এদিকেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুস্থ বিবেক দান করুন। গুনাহমুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন। আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো, নিজেদেরকে গুনাহমুক্ত করে গড়ে তোলা। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আন্ত রিকভাবে তাওবা করা। আর সবিনয়ে দু'আ করা।

ওযীফা নয়, ভাবতে হবে গুনাহমুক্ত জীবনের কথা

সারকথা হলো, নফল ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে থাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভালো কাজ। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা। আমাকে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্নজন ফোন করে বলেন, হুযূর! অমুক কাজের জন্য একটা দু'আ বলে দিন। অমুক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটা আমল বলে দিন। আমাদের মহিলারা মনে করেন, প্রতিটি কাজ হাসিলের জন্য মনে হয় স্বতন্ত্র একটি দু'আ আছে। আমি বলি, এ দু'আ ও অযীফা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গুনাহ বর্জন। তাই নিজে ও ছেলে-সন্তানেরা গুনাহমুক্ত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এ বিষয়ে যদি আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নিই, তাহলে দু'আ ও অযীফা দিয়ে গুনাহের ক্ষতিগুলো ঠেকানো যাবে না। দু'আ ও অযীফা তখনই কাজে আসবে, যখন গুনাহমুক্ত থাকার মানসিকতা আমার মাঝে যথাযথভাবে থাকবে। গুনাহ বর্জন করার পথে অগ্রসর হলে তখন দু'আ ও অযীফা অন্তরে সাহস ও প্রশান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ হয়। কিন্তু আমরা যদি গুনাহমুক্ত থাকার কথা না ভাবি, অলসতা ও গাফলতির চাদর মুড়িয়ে বসে থাকি আর দু'আ ও অযীফা আদায় করাকেই সবকিছু মনে করি, তাহলে এ পথ হবে বড়ই হতাশার।

গুনাহেরও হিসাব নিতে হবে

সারকথা হলো, আমাদেরকে গুনাহ পরিহার করার কথা ভাবতে হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টার হিসাব নিতে হবে। গুনাহের তালিকা তৈরি করতে হবে। যেসব কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অপছন্দ করেন, তার একটা ফিরিস্তি তৈরি করতে হবে। তারপর দেখতে হবে এর মধ্যে কোন কোন গুনাহ আমি এখনই ছাড়তে পারি। সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। আর যেসব গুনাহ বর্জনের জন্য পথ বের করা প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য পথ বের করতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হবে।

তাহাজ্জুদগুজারের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হওয়ার কৌশল

এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বলেছেন, কেউ যদি তাহাজ্জুদগুজার ও ইবাদতগুজার থেকেও আগে বেড়ে যেতে চায়, তাহলে সে যেন নিজেকে

গুনাহমুক্ত রাখে। যেমন আমরা ওলী-বুযুর্গদের জীবনী পড়ি। তাঁরা রাতভর ইবাদত করতেন।

এখন কেউ যদি চায় আমি এসব বুযুর্গের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যাবো, তাহলে তাকে প্রথমেই গুনাহ ছাড়তে হবে। কারণ, নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে পারলেই আল্লাহ তা'আলা নাজাতের ফয়সালা করবেন। এমন যদি হয় যে, তুমি গুনাহমুক্ত ছিলে আর তোমার প্রতিযোগী ওই ওলীও গুনাহমুক্ত ছিলেন, তাহলে মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি তোমার চাইতে সামনে চলে গেলেও নাজাতের ক্ষেত্রে তোমরা উভয় কিন্তু সমান সমান। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদতে ডুবে থাকে এবং গুনাহতেও ডুবে থাকে আর তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাক; কিন্তু ইবাদতে ডুবে থাক না, তাহলে এমন ব্যক্তি নাজাত পাবে না। কিন্তু তুমি নাজাত পেয়ে যাবে।

মুমিন ও তার ঈমানের উপমা

সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন ঈমানদার ও তার ঈমানের উপমা হলো এমন যেমন একটি ঘোড়াকে দীর্ঘ একটি রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফলে ঘোড়াটি ঘুরেও বেড়ায় আবার একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গিয়ে থেমেও যায়। রশিটি তাকে ওই সীমানাটা অতিক্রম করতে দেয় না। তাই ঘোড়াটি ঘুরে-ফিরে তার বৃত্তের মাঝে চলে আসে। এখানে ঘোড়াকে যে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে, তা দুটি কাজ করছে। প্রথমত, ঘোড়াটিকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে আটকে রাখছে। দ্বিতীয়ত, খুঁটিটিই তার আশ্রয়স্থল। ঘুরে ফিরে তাকে এখানেই আসতে হয় এবং এখানে এসেই সে বসে পড়ে।

এ উপমাটি বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের খুঁটি হলো তার ঈমান। তাই ঈমান একজন মুমিনকে একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়। সে যদি সীমানা অতিক্রম করে লাগামহীন হয়ে যেতে চায়, খুঁটিটি তাকে টেনে ধরে। তাই ঘুরে-ফিরে আবার চলে আসে খুঁটির গোড়ায়।

সারকথা হলো, মুমিনের ঈমান এতটাই বলীয়ান, যা তাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যদিওবা কখনও ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করে; কিন্তু অবশেষে ঈমানের ছায়াতলে ফিরে আসে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কত সুন্দর উপমা দিয়ে আমাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমানের খুঁটি মজবুত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

গুনাহ বিলম্বে লেখা হয়

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুজন ফেরেশতা থাকেন। একজন তার নেক আমলগুলো এবং অন্যজন তার বদ-আমলগুলো লিপিবদ্ধ করেন। আমি আমার শাইখ মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) কে বলতে শুনেছি, নেকী লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাকে এমর্মে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে যে, বান্দা যখন নেক আমল করবে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করে নিবে। পক্ষান্তরে বদ-আমল লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে যে, বান্দা যখন কোনো গুনাহ করবে. তখন লেখার পূর্বে নেকলেখক ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করে নিবে– এটা কি লিপিবদ্ধ করবো, না করবো না? অর্থাৎ এ দুই ফেরেশতার মধ্যে নেকলেখক ফেরেশতা হলেন আমীর। তাই বান্দা গুনাহ করলে তা আমলনামায় উঠানোর পূর্বে আমীরকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। অনুমতি চাওয়ার পর নেকলেখক ফেরেশতা বলেন, না! একটু অপেক্ষা কর। যদি সে তাওবা করে নেয়, তাহলে তো আর লেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি বান্দা দ্বিতীয়বার গুনাহ করে, অথচ পূর্বের গুনাহের জন্য এখনও সে তাওবা করেনি, তখন নেকলেখক ফেরেশতার কাছে পুনরায় অনুমতি চাওয়া হয়– এখন লিখবো কি? তখন সে বলে, আরেকটু অপেক্ষা কর। এভাবে বান্দা তৃতীয়বার গুনাহ করার পর যখন অনুমতি চাওয়া হয়, তখন নেকলেখক ফেরেশতা বলে, এখন লেখ। তারপর ওই গুনাহটি বদআমল লেখক ফেরেশতা বান্দার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে ফেলে। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সঙ্গে কত সহজ আচরণ করেন। তাওবার ব্যবস্থাটা কত সহজ করেছেন তিনি।

গুনাহ যেখানে তাওবাও সেখানে

এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা-ইসতেগফার করে নিবে। যাতে গুনাহটি তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ না হয়। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন, যে মাটিতে গুনাহ করেছো, সেখানেই সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা ইসতেগফার করে নাও। যেন কেয়ামত দিবসে সেই মাটি তোমার গুনাহের সাক্ষ্য যখন দিবে, তখন সেই সঙ্গে যেন তাওবার সাক্ষ্যও সে দিতে পারে। এসবই মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী– ঈমান মুমিনের জন্য খুঁটি। ঘুরে-ফিরে তাকে এ কেন্দ্রবিন্দুতেই আশ্রয় নিতে হয় এর প্রকৃত বাস্তবায়ন।

গুনাহসমূহ বর্জনের প্রতি যত্নশীল হবে

সারকথা হলো, সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে সমূহ গুনাহ বর্জন করে চলা এবং এর জন্য গুরুত্বসহ চিন্তা করা। কারণ, এ নিয়ে না ভাবলে এ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। এরপরেও যদি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় কর্তব্য হলো তাওবা-ইসতেগফার করে নেয়া। এ দুটি কাজ করতে থাক। 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। লাগামহীনতা বড়ই খারাপ বিষয়। এটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিকৃত করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অন্যায় ও অপরাধকে রুখে দিন

বর্তমানে অন্যায় অপরাধের জোয়ারে ভাসছে আমাদের সমাজ। ধরে নেয়া যাক, এগুলোকে প্রতিরোধ করার মত শক্তি-সামর্থ আমাদের নেই। তাই বলে কি আমরা নির্বিকার বসে থাকবো? না। বরং আমাদের মনের মাঝে অস্থিরতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের মনে অন্যায় প্রতিরোধের অস্থিরতা তৈরি হলে সমাজ একসময় 'ইনশাআল্লাহ' পাপমুক্ত হয়ে যাবে।

অন্যায় ও অপরাধকে রুখে দিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ ، فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ، فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ، وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ (صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সাহাবী হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করেই শুধু ক্ষান্ত না হয়; বরং হাত দ্বারা তা ভালো কাজে রূপান্তরিত করে দেয়। সম্ভব না হলে মুখ দ্বারা তা যেন পরিবর্তন করে দেয়। অর্থাৎ অন্যায়কারীকে বলবে যে, ভাই, আপনি যা করছেন, তা ভালো

নয়। এ পথ ছেড়ে সৎপথে চলে আসুন। এটাও সম্ভব না হলে মনে-মনে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে এবং পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করবে। এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

মুক্তির চার উপায়

সূরা আসর-এ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

এখানে সময়ের কসম খেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা চারটি কাজ করে– (১) ঈমান আনে (২) সৎকাজ করে (৩) পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয় (৪) সবরের উপদেশ দেয়। حق-এর অর্থ হলো, সকল ফরয কাজ আদায়ের জন্য কাউকে বলিষ্ঠ উপদেশ দেয়া।

صبر-এর অর্থ হলো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেয়া। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঈমান ও সৎকর্ম যতটুকু জরুরি, ততটুকু জরুরি অন্য মুসলমানকেও ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করা। মুক্তির জন্য কেবল নিজের আমলই যথেষ্ট নয়।

একজন আবেদ যে কারণে ধ্বংস হল

রাসূলুল্লাহ (সা.) অতীত কোনো এক জাতির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ওই জাতির লোকেরা অন্যায়– অপরাধে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলো বিধায় আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, অমুক জনপদকে উল্টে দাও। জিবরাইল (আ.) আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আপনি এমন এক জনপদকে উল্টে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, যেখানে বাস করেন আপনার এমন এক বান্দা, যিনি সারাক্ষণ আপনার যিকির করেন। তাঁর জীবনটাই তো কেটেছে আপনার ইবাদতে, তাঁকে সহই কি উল্টে দেবো? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, তাকে সহই গোটা জনপদটাকে উল্টে দাও। ধ্বংস করে দাও তাকেও। কেননা, সে নিজে ভালো কাজ করত ঠিক, কিন্তু তার সামনে কোনো অন্যায় হতে দেখলে বাধা দিতো না। এমনকি তার চেহারাও মলিন হতো না। সুতরাং তাকেও ধ্বংস করে দাও।

নিরপরাধ ও আযাবের জালে আটকে যাবে

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً (سورة الأنفال ٢٥)

অর্থাৎ– এমন আযাব থেকে বেঁচে থাক, যা শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকদেরকেও গ্রাস করবে। কারণ, এ সকল লোক যদিও পাপীদের সঙ্গে অন্যায় কাজে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তাতে যারা লিপ্ত ছিল, তাদেরকে বাধা না দেয়ায় 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' বর্জন করার অপরাধে অপরাধী।

সারকথা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা থেকে আমরা উদাসীন। শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেও অন্যকে বাঁচানোর চিন্তা আমরা মোটেও করি না।

অসৎ কাজে বাধা প্রদানের প্রথম স্তর

উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসৎ কাজে বাধা প্রদানের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, সামর্থ ও শক্তি থাকলে হাত দ্বারা বাধা দেয়া। শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বাধা প্রদান না করলে সে নিজেও একই অপরাধে অপরাধী হবে। যেমন এলাকার সরদার। লোকেরা তাকে মানে, তার কথা শোনে। সে যদি তার এলাকায় অন্যায় কাজ হতে দেখে, এমতাবস্থায় তার দায়িত্ব হলো নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যায় কাজটি রুখে দেয়া। তখন এ চিন্তা করা যাবে না যে, বাধা দিলে অমুক গোস্বা করবে। অমুকের মন ভেঙে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের সামনে কারো মন ভাঙার প্রতি তাকানো যাবে না।

কবি ফয়জীর ঘটনা

বাদশাহ আকবরের যুগের বিখ্যাত কবি ফয়জী নাপিতের কাছে দাড়ি মুণ্ডাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক বুযুর্গ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কবি ফয়জীকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

آغا! ریش می تراشی؟

আপনি কি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছেন?

কবি ফয়জী ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত। কুরআন মজীদের তাফসীর তিনি 'নুকতা' ছাড়া লিখেছিলেন। বুযুর্গ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাচ্ছিলেন, আপনি

একজন পণ্ডিত আলেম। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এরপরেও আপনি এ কাজ করছেন?

কবি ফয়জী উত্তর দিলেন–

بلے، ریش می تراشم - دل کسے نمی خراشم

জ্বি হ্যাঁ, আমি দাড়ি মুণ্ডাচ্ছি, কিন্তু কারো মন তো ভাঙছি না।

মূলত কবি ফয়জী বলতে চাচ্ছিলেন, আমি গুনাহ করছি ঠিক, কিন্তু আপনি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে আমার মনে কষ্ট দিলেন। এটাও তো গুনাহ।

বুযুর্গ উত্তর দিলেন–

وے دل رسول اللہ می خراشی

হ্যাঁ, আমি আপনার মন ভেঙেছি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তর তো ভাঙিনি।

কেননা, দাড়ি মুণ্ডানো তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মন ভাঙার নামান্তর। অথচ আপনি তা-ই করছেন।

মন ভেঙে যাওয়ার পরওয়া করো না। জনশ্রুতি আছে, কারো মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। আসল ব্যাপার হলো, দরদ ও ভালোবাসার মাধ্যমে কাউকে অন্যায় কাজ থেকে বাধা দিলে যদি সে মনে কষ্ট পায়, তাহলে এটা বিবেচ্য নয়। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের সামনে কারো মনভাঙার বিষয়টি কিছুই নয়।

ফরয তরক হবে

মান্যবর ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে লোকদেরকে বাধা না দিলে তিনিও গুনাহগার হবেন। যেমন শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে, পীর সাহেব তার মুরিদদেরকে, অফিসার তার অধীনস্থদেরকে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজ থেকে বাধা না দিলে ফরয তরকের গুনাহ হবে।

ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে কখনও যদি হাত দ্বারা বাধা দিলে বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কিংবা এর চেয়েও বড় ধরনের গুনাহ সংগঠিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মুখের কথা দ্বারা বাধা দিবে। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যেমন সিনেমা হলের সামনে টাঙানো অশ্লীল ছবির পোস্টার কেউ যদি ছিড়ে ফেলে, তাহলে সে নিজেও ফ্যাসাদে পড়বে এবং অন্যদেরকে এ ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। সুতরাং, এ কাজ শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে বলে বিবেচিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু মুখের কথা দ্বারাই বাধা দিবে।

নেতৃস্থানীয় লোকদের দায়িত্বে অবহেলা

বর্তমান সমাজে যেসব অন্যায়-অপরাধ দেখা যাচ্ছে, এর মূল কারণ হলো, নেতৃস্থানীয় লোকেরা অন্যায় দেখে চুপ করে থাকে। বরং তারা নিজেরাও অন্যায়ের ভেতর ঢুকে পড়ে। যেমন বর্তমানে বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে যেসব অশ্লীলতা বেড়ে চলেছে, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তা নিজের চোখে দেখার পরেও হাত কিংবা মুখ দ্বারা বাধা দিচ্ছে না। বরং তারা নিজেরাই তাতে জড়িয়ে পড়ছে আর বলছে, কী করবো; ভাতিজার বিয়েতে থাকতে তো হয়। অথচ তাদের তো উচিত ছিলো, নিজে অন্যায়ে জড়িত না হয়ে বরং হাত ও যবানের মাধ্যমে অন্যায় কাজটি রুখে দেয়া।

অনুষ্ঠানটি কি বিয়ের, না নৃত্যের!

অন্যায়ের স্রোতধারা বইছে বর্তমানের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে। একটা সময় ছিলো যখন এসব অনুষ্ঠানে এরকম উদ্দাম অন্যায় ছিলো না। কিন্তু আজ ধীরে-ধীরে এসব অন্যায় সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। অন্যায় অন্যায়কে টানে। এটাই স্বাভাবিক। যার ফলে অন্যায়ের অস্বাভাবিক স্রোতে ভাসছে আজকের সমাজ। মনে রাখবেন, এ পরিস্থিতিতে যদি আমরা ঘুরে না দাঁড়াই এবং এসব অন্যায়ের প্রতিরোধ না করি, তাহলে সমাজ আরো গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে একদিন ছিলো। শোনা যায়, এখন যুবক-যুবতীদের নৃত্য শুরু হয়েছে। আর কতদিন সইবেন এসব অন্যায়?

কতদিন হাতিয়ার ছেড়ে দিয়ে থাকবেন? অন্যায়ের এ স্রোতে আর কতদিন ভাসবেন? এরও তো একটা সীমা থাকা উচিত। যেদিন টের পাবেন, সেদিন দেখবেন, স্রোতের পানি মাথার উপরে চলে এসেছে। তখন টের পেলেও হয়ত কাজ হবে না। তাই যা করার এখনই করুন। এর জন্য আল্লাহর কিছু বান্দা তৈরি হয়ে যান।

অনেক সময় এ বলে বিয়ের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করি না যে, অমুক সময় সে আমাকে সম্মান করেনি। সুতরাং তাকে আগে মাফ চাইতে হবে, তারপর তার অনুষ্ঠানে যাবো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ ধরনের অভিমান অসাধারণ কোনো কিছু নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কিছু বান্দা যদি এ বলে বেঁকে বসে যে, যে অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হবে কিংবা নৃত্যশালা বসবে, সে অনুষ্ঠানে আমরা যাবো না, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ জাতীয় অন্যায় আর সামনে বাড়তে পারবে না।

অন্যথায় মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে

অবশ্য এ ক্ষেত্রে যেমনি ছাড়াছাড়ি কাম্য নয়, তেমনি বাড়াবাড়িও উচিত নয়।

অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া যেমনিভাবে অন্যায় অনুরূপভাবে বাধাদানের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শনও অন্যায়। কেননা, এতে অনক সময় হীতে বিপরীত হয়। তাই এক্ষেত্রে কাজ করতে হবে বুঝে-শুনে। প্রয়োজনে কোনো মুরব্বী বা আলেমের পরামর্শ নিতে হবে। যেভাবেই হোক এ ফেতনাকে রুখতে হবে। অন্যথায় একদিন মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ অন্যায় প্রতিরোধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অসৎকাজে বাধা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর

অসৎকাজ হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে যবানের মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করতে হবে। আলোচ্য হাদীসে এটাই অসৎ কাজে বাধা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে উল্লেখ হয়েছে। যবানের মাধ্যমে বাধা প্রদানের অর্থ হলো, অন্যায় অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে জনসম্মুখে কিংবা লোকালয়ে হেয়-প্রতিপন্ন নয়, বরং নির্জনে কোমল আচরণের মাধ্যমে ভালোবাসা দিয়ে বোঝাবে যে, ভাই, আপনার কাজটি অন্যায়, এটি না করা উচিত।

মনে রাখবেন, যবানের মাধ্যমে অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার অর্থ এটা নয় যে, এটা একটি রুক্ষ পাথর, যা অন্যায়কারীর গায়ে মেরে দিতে হবে কিংবা এটি একটি লাঠি, যা তার মাথায় ছুঁড়ে মারতে হবে। বরং দরদ ও কোমলতার সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। দেখুন, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

লোকদেরকে আপন পালনকর্তার পথে কৌশল ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহবান করুন। -(সূরা নাহল : ১২৫)

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন–

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا – (سورة طه ٤٤)

তোমরা তার সঙ্গে কথা বলবে কোমলভাবে। আল্লাহ তা'আলা তো জানতেন যে, এ নরাধম ঈমানের আলোকিত পথে আসবে না। এরপরেও তিনি তার সঙ্গে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো সংশোধনকারী যেমনিভাবে হবে না, তেমনিভাবে ফেরাউনের চেয়ে প্রথভ্রষ্ট ও দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং নবীদেরকে যখন নির্দেশ দেয়া হয়েছে এমন একজন পাপিষ্ঠের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলার, তাহলে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নরম আচরণের নির্দেশ আমাদের প্রতি রয়েছে আরো জোরালোভাবে। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যবান কোমলতা মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। তরবারির মত ব্যবহার করা যাবে না।

এক যুবকের ঘটনা

এক যুবক এলো আল্লাহর রাসূলের দরবারে। বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন। আমি আর পারছি না। দেখুন, যুবকটি আল্লার রাসূল (সা.)-এর কাছে কেমন আবদার করেছে। ব্যভিচারের মতো অন্যায় কাজের অনুমতি চেয়েছে। বর্তমানে কোনো পীর সাহেবের কাছে তার কোনো মুরিদ এরূপ কিছু চাইলে তিনি কী করতেন তাকে। নিশ্চয় ঘাড় ধরে বের করে দিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবকটির উপর রাগ হলেন না; বরং ভাবলেন, আহা বেচারা! অসুস্থ, অনুকম্পার উপযুক্ত। তিনি তাকে কাছে ডাকলেন। আদর করে তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, এর আগে তুমি আমাকে বল তো, তোমার বোনের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কেউ করতে চাইলে তোমার কি তা পছন্দ হবে? যুবক বললো, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার বললেন, তোমার মা কিংবা মেয়ের সঙ্গে এ আচরণটি কেউ করতে চাইলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? যুবক বললো, না, তা আমি মোটেও পছন্দ করবো না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যে মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করবে, সেও তো নিশ্চয় কোনো ব্যক্তির মা বা বোন বা মেয়ে হবে। ওই ব্যক্তি কি কখনও তার মা-বোন বা মেয়ের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ মেনে নিবে? একথা শোনার পর যুবক বললো, এখন আমার সুমতি হয়েছে। আমি বুঝেছি। এ কাজটি আমি কখনও করবো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবকটিকে পরিশুদ্ধ করলেন এভাবেই।

এক গ্রাম্য লোকের ঘটনা

এক গ্রাম্য লোক এলো মসজিদে নববীতে। আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উপবিষ্ট। লোকটি এসেই তড়িঘড়ি করে দু'রাকাত নামায পড়ে নিলো। তারপর এক বিস্ময়কর দু'আ করলো–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا –

হে আল্লাহ! দয়া করুন আমাকে আর মুহাম্মদ (সা.)-কে। এছাড়া আর কারো উপর দয়া দেখাবেন না।'

দু'আটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কি হে! তুমি তো আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছ!

কিছুক্ষণ পর লোকটি পেশাব করে দিলো একেবারে মসজিদের আঙিনায়।

সাহাবায়ে কেরাম তাকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, পেশাব করতে দাও। একে বাধা দিও না। লোকটির পেশাব করা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। আর লোকটিকে বুঝিয়ে বললেন, এটি মসজিদ। দুর্গন্ধ ও অপবিত্র করার জন্য একে বানানো হয়নি। একে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হয় সব সময়। কারণ, এটা আল্লাহর ঘর।

দেখুন, রাসূলুল্লাহর (সা.) কঠোর বাক্যের পরিবর্তে কোমল কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এ গ্রাম্য লোকটিকে।

তোমাদের কাজ কথা পৌছিয়ে দেয়া

প্রশ্ন আসে, মানুষকে নরম কথা বললে তো শুনতে চায় না, মানতে চায় না। এর উত্তর হলো, মানা- না- মানা অন্যায় প্রতিরোধকারীর দায়িত্ব নয়। তাঁর দায়িত্ব হলো সঠিকভাবে হক কথাটি শুধু পৌছিয়ে দেয়া। যেমন কুরআন মজীদে ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, একটি সম্প্রদায় পাপাচারে ডুবে ছিলো। শুদ্ধ পথে আসার কোনো সম্ভাবনা তাদের মাঝে ছিলো না। ফলে তারা আযাবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক সে সময় আল্লাহর কিছু নেক বান্দা তাদেরকে কোমলভাবে বোঝালেন যে, তোমরা কাজটি করো না। এটা শুনে কেউ একজন নসীহতকারীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো–

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ (سورة الأعراف ١٦٤)

তোমরা এমন এক সম্প্রদায়কে উপদেশ কেন দিচ্ছো, আল্লাহর ফয়সালায় যাদের ধ্বংস অনিবার্য? এরা শুদ্ধ হবে– এ আশা নিতান্তই দুরাশা।

তখন আল্লাহর নেক বান্দারা উত্তর দিলেন– مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর সামনে দোষমুক্তির জন্য।

অর্থাৎ– যখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন– তোমাদের সামনে এ অন্যায় কাজ হয়েছে, তোমরা প্রতিরোধের কী চিন্তা করেছিলে? তখন আমরা ওজর পেশ করে বলবো যে, আমরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সৎ পথের প্রতি দাওয়াত দিয়েছি।

মূলত ইসলামের পতাকাবাহীর অন্তরে এ অনুভূতি জাগরুক থাকলে তার দাওয়াত তখন লোকেরা না মানলেও আশা করা যায় সে দায়িত্বমুক্ত। হযরত নূহ (আ.)-এর সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতে মাত্র উনিশজন লোক সৎপথে এসেছিলেন। এর কোনো দায় হযরত নূহ (আ.)-এর উপর বর্তাবে না। কারণ, তাঁর দায়িত্ব তো ছিলো শুধু পৌঁছে দেয়া। এ দায়িত্বে তিনি কোনো অবহেলা করেননি।

অসৎ কাজে বাধা দেয়ার তৃতীয় স্তর

উল্লিখিত হাদীসে আরেকটি পদ্ধিতি বর্ণিত হয়েছে যে, যদি মুখ বা হাত দ্বারা বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অন্তর দ্বারা খারাপ কাজকে ঘৃণা ও পরিবর্তন করবে। অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, ঐ খারাপ কাজের ব্যাপারে এমন ঘৃণা প্রকাশ করা যে, তার চেহারায় অসন্তুষ্টির প্রতিক্রিয়া যেন ফুটে উঠে এবং মন অস্থির হয়ে যায়, ফলে হাত বা মুখ দ্বারা বাধা প্রদানের সুযোগ খোঁজ করে।

নিজের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করুন

বর্তমানে অন্যায়-অপরাধের জোয়ারে ভাসছে আমাদের সমাজ। ধরে নেয়া যাক, এগুলো প্রতিরোধের মত শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই বলে কি আমরা নির্বিকার থাকবো? না। বরং আমাদের মনের মাঝে অস্থিরতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের মনে অন্যায় প্রতিরোধের অস্থিরতা তৈরি হলে ইনশাল্লাহ' এক সময় সমাজ পাপাচারমুক্ত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অস্থিরতা

আইয়ামে জাহিলিয়্যা। এ যুগেই এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। তখনকার সমাজ আকণ্ঠ পাপাচারে ডুবে ছিলো। শিরক, কুফর, মূর্তিপূঁজা, আল্লাদ্রোহিতা

প্রকাশ্য অন্যায়সহ হাজারো পাপাচারে সমাজ ছিলো জর্জরিত। কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না কেউই। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্দেশ দেয়া হলো এদেরকে শুদ্ধ করার ফিকির করুন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিন বছর তো তাঁর কেটেছিলো হেরা গুহাতে ধ্যানমগ্ন ও আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাতের মাধ্যমে। এ তিন বছরে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতিও তাঁকে দেয়া হয়নি। দীর্ঘ এ তিন বছর তিনি শুধু সমাজকে দেখেছেন, পাপাচারগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিজের মনে এগুলোর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি করেছেন। অন্তরকে অন্যায়-অপরাধের মোকাবেলায় বিদ্রোহী করে তুলেছেন। অন্যায়-অপরাধকে দূর করার জন্য অন্তরের মাঝে অস্থিরতা তৈরি করেছেন।

কারণ, এটাই ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। অবশেষে এ অস্থিরতার মাঝেই রং ধরা শুরু হলো। তারপর যখন দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি তিনি পেলেন, তখন অস্থির হৃদয় নিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিয়ে সমাজের মানুষের সামনে নিজের কথাগুলো রাখলেন। তাঁর অস্থিরতার বিবরণ কুরআন মজীদ চিত্রিত করেছে এভাবে—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (سورة الشعراء : ٣)

মানুষ ঈমান আনে না কেন—এ দুঃখে আপনি নিজেকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবেন না কি? —(সূরা শু'আরা : ৩)

তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغْ

আপনার কাজ হলো শুধু তাবলীগ করা।

নিজেকে এভাবে টেনশনে ফেলে রাখবেন না। এতটা অস্থিরতা দেখাবেন না।

এরপরেও তিনি ছিলেন অস্থির। তাঁর কাছে যে-ই আসতো, তাকেই জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির পথ দেখানোর ফিকির তাঁর অন্তরে থাকতো।

আমরা হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছি

আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমাদের মাঝে এ অস্থিরতাটা নেই। অন্যায়কে আমরা আজ অন্যায়ই মনে করি না। বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে। অন্যায় অপরাধ করতে দেখলেও মনের মাঝে সামান্যতম ব্যথাও অনুভূত হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে অন্যায়কে অন্যায় হিসাবে বড় করে দেখে না। তাই তা দূর করার অস্থিরতাও তার মাঝে থাকে না।

কথায় কাজ হয় কখন?

অন্যায় দেখে মন অস্থির হলে তখন আল্লাহ তা'আলা তার কথার মাঝে একপ্রকার 'শক্তি' তৈরি করে দেন। হযরত মাওলানা নানুতুবী (রহ.) বলতেন, দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ণ জযবা যার অন্তরে আছে, সে-ই মূলত দাওয়াত ও তাবলীগের হকদার। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যে অস্থিরতা, যেমন ক্ষুধা লাগলে খাবারের জন্য অস্তিরতার মতই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যও অস্থিরতা থাকতে হবে। তবে সে-ই হতে পারে দাওয়াত ও তাবলীগের আসল হকদার। হযরত শাহ ইসামাঈল শহীদ (রহ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এরূপ জযবাই দান করেছিলেন। ফলে তাঁর একেকটি ওয়াজে হাজার-হাজার মানুষ গুনাহ থেকে তাওবার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে হাত রাখতো।

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) একবার টানা দেড় থেকে দুঘন্টা ওয়াজ করেছিলেন দিল্লির জামে মসজিদে। ওয়াজ শেষ করে তিনি মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে প্রবেশ করলো মসজিদে এবং তাঁকেই জিজ্ঞেস করলো, ভাই! মৌলভী ইসমাঈল সাহেবের ওয়াজ কি শেষ হয়ে গিয়েছে?

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভাই! শেষ হয়ে গিয়েছে।

এটা শুনে লোকটি বললো, আহা! আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আমার এতদূর আসাটাই বিফলে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাই! খুব আশা করে এসেছি যে, মৌলভী ইসমাঈলের ওয়াজ শুনবো। এখন তো দেখি আসাটাই বৃথা গেলো। একথা শুনে ইসমাঈল শহীদ (রহ.) বললেন, ভাই আমিই ইসমাঈল। আসুন, এখানেই বসে পড়ুন। এ বলে তিনি লোকটিকে ওখানেই বসিয়ে দিলেন এবং সিঁড়িতে বসেই শুধু একটি লোককে সম্পূর্ণ ওয়াজ দ্বিতীয়বার শোনালেন। পরবর্তীতে কেউ একজন তাঁকে এর 'কারণ' জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ওয়াজ তো আমি একজনের জন্যই করেছি। বড় মাহফিল ও অনেক লোকের সমাগম কিংবা এক-দুজন শ্রোতা হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, উভয়টাই তো আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এসব বুযুর্গের কিছু জযবা ও ইখলাস আমাদের অন্তরে দান করুন। আমীন।

মনে রাখবেন, এ জযবা, অস্থিরতা, আকুলতা ও ইখলাস যখন আসবে, তখন কমপক্ষে আমার ঘর-বাড়ির লোকেরা তো আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।

সারকথা

সারকথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে সামর্থ্য থাকলে হাত দ্বারা, তা না হলে মুখ দ্বারা বাধা দেওয়া, তাও না হলে অন্তত অসৎ কাজটিকে ঘৃণা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

জান্নাতের দৃশ্যাবলী

"... জান্নাতেও প্রয়োজন হবে ওলামায়ে কেরামের। সকলেই ছুটে যাবে তাঁদের নিকট। জানতে চাইবে— এমন কী নেয়ামত আছে, যা আমরা এখনও পাইনি? ওলামায়ে কেরাম জানাবেন, হ্যাঁ, একটি নেয়ামত তোমরা এখনও পাওনি— আল্লাহ দীদার। সুতরাং সকলেই আল্লাহর কাছে তাঁর দীদার প্রার্থনা করো।

সেদিন সমবেত সকল জান্নাতীর সামনে আল্লাহ তা'আলা আপন সত্তাকে প্রকাশ করবেন। জান্নাতীদের কাছে মনে হবে, এ মহান নেয়ামতের তুলনায় পূর্বের সকল নেয়ামত একেবারে তুচ্ছ। মনে হবে, এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এভাবে মহান প্রভুর দীদার লাভের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে এ দরবারের সমাপ্তি ঘটবে। তারপর সকলেই পৌঁছে যাবে নিজ–নিজ ঠিকানায়।"

জান্নাতের দৃশ্যাবলী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝ (سورة الزخرف : ٧٢-٧٣)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সম্মানিত ভাইয়েরা!

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। এ জন্য কোনো বিদ্যা বা কৌশল মানুষ আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। এ পৃথিবীকে যে বিদায় জানিয়েছে, কেবল সে-ই বলতে পারে ওখানকার অবস্থা। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি, তারা ওখানকার সম্পর্কে কিছুই জানি না।

এক বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) প্রায়ই এক বুযুর্গের ঘটনা আমাদেরকে শোনাতেন। বুযুর্গকে তাঁর মুরিদরা একদিন বললো, হযরত, এ পৃথিবী ছেড়ে যে-ই চলে গেছে, সে আর ফিরে এসে আমাদের কোনো খবর দিচ্ছে না, সে কোথায় গেলো, তার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হলো, কী দৃশ্য সে দেখলো– কিছুই আমাদেরকে জানাচ্ছে না। তাই আমাদেরকে একটা উপায় বলে দিন, যেন আখেরাতের সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। সেখানকার যাবতীয় অবস্থা জানতে পারি।

বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা! আমার যখন মৃত্যু হবে, তারপর যখন কবরে রাখা হবে। তখন তোমরা আমার কাছে একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ রেখে দিয়ো। তাহলে সুযোগ পেলে তোমাদেরকে সেই জগতের অবস্থা লিখে জানাবো। বুযুর্গের কথায় মুরিদরা খুব প্রীত হলো যে, এতদিন পর একটা উপায় পাওয়া গেলো।

একদিন বুযুর্গের ইনতেকাল হলো। তাঁকে কবরে রাখা হলো। তখন একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ তাঁর পাশে রেখে দেয়া হলো। বুযুর্গ ওই সময় একথাও বলে রেখেছিলেন যে, দ্বিতীয় দিন এসে তোমরা আমার কবর থেকে কাগজটি তুলে নিয়ো। সে অনুযায়ী যখন তারা বুযুর্গের কবরের কাছে গেলো, দেখতে পেলো কবরের উপর এক টুকরো লিখিত কাগজ পড়ে আছে। কাগজটি দেখে তো তারা মহা খুশি যে, এতদিন পর পরকাল সম্পর্কে কিছু সংবাদ তো পাওয়া গেলো। কিন্তু কাগজটি হাতে নেয়ার পর দেখতে পেলো তাতে লেখা আছে–

یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں ، بتانے والے نہیں

এখনকার অবস্থা দেখার লোক আছে –বলার লোক নেই।

সত্য-মিথ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। হতে পারে ঘটনাটি সত্য আবার মনগড়াও হতে পারে। ঘটনাটি যা-ই হোক, বাস্তবতা এমনই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পরকালীন অবস্থাকে এমন দুর্বোধ্য করে রেখেছেন, যার সম্পর্কে এ জগতের কেউ কিছু জানে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এবং পবিত্র হাদীসে তাঁর রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে যতটুকু বলেছেন, আমাদের জানার ঝুলি ততটুকুই। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সেখান থেকে কিঞ্চিত আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সর্বনিম্ন জান্নাতীর অবস্থা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ! বেহেশতিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিম্নস্তরের বেশেহতে কে থাকবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছিলেন, যখন সকল বেহেশতি জান্নাতে চলে যাবে, জাহান্নামিরা চলে যাবে জাহান্নামে তখন এক ব্যক্তি জান্নাতের বাইরে থেকে যাবে। সে জান্নাতের আশেপাশে কোথাও ঠাঁই নিবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, দুনিয়াতে থাকাকালে নিশ্চয় তুমি বড়-বড় রাজা বাদশার বিভিন্ন গল্প শুনেছ।

সেসবের মধ্য থেকে তোমার পছন্দনীয় আমাকে বল। কতটা বিস্তৃত ছিলো তাদের রাজত্ব তোমার দ্বারা যতটা সম্ভব আমাকে শোনাও।

তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ আমি অমুক-অমুক বাদশাহর গল্প শুনেছি। তাদের রাজত্ব ছিলো বিশাল। তারা আপনার পক্ষ থেকে বিপুল নেয়ামত পেয়েছিলো। আহা! আমিও যদি সেরকম রাজত্ব পেতাম! এভাবে সে তার জ্ঞানের ঝুলি থেকে চারজন বাদশার গল্প শোনাবে, যারা দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছিলো। বিস্তারিত শোনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি তো তাদের রাজত্বের কথা শোনালে, তাদের এলাকার কথাও শোনালে; কিন্তু তাদের জীবনের ভোগ-বিলাসের কথা তো কিছুই বললে না। তখন সে তার ইচ্ছেমত তাদের সেসব ভোগ-বিলাসের কথা তুলে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা, যেসব রাজা-বাদশাহর গল্প, তাদের রাজত্বের গল্প, তাদের এলাকার গল্প ও ভোগ-বিলাসের গল্প আমাকে শুনিয়েছ, তার সবগুলোই যদি একসঙ্গে তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি খুশি হবে? তখন লোকটি আরয করবে, হে আল্লাহ! এর চাইতে মহান নেয়ামত আর কী হতে পারে? আমি অবশ্যই খুশি হবো। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার গল্পের চার রাজা-বাদশাহ্, তাদের নয়নাভিরাম রাজত্ব ও ভোগ-বিলাসের চেয়েও দশগুণ প্রাচুর্য্য আমি তোমাকে দান করলাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, সর্বনিম্ন বেহেশতির অবস্তা হবে এমনই। এ কথা শোনার পর হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! এ যদি হয় সর্বনিম্ন বেহেশতির অবস্থা, তাহলে আপনার সেই প্রিয় বান্দার অবস্থা কেমন হবে, যাকে আপনি উচ্চতর জান্নাত দান করবেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, তার সম্মানে আমি যেসব আয়োজন করবো, সেগুলো তো সৃষ্টি করে আমি এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে এমনভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি যে–

مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ يَسْمَعْ اُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ

যা কোনো চোখ দর্শন করেনি, কোনো কান যার কথা শ্রবণ করেনি এবং যা কোনো মানুষ আজও কল্পনা করেনি।

আরেকজন সর্বনিম্ন জান্নাতির অবস্থা

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার অবস্থা হবে– বদ-আমলের কারণে প্রথমে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কারণ, মুমিন বান্দাও বদ-আমল করলে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এজন্য সে প্রথমে জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে দগ্ধ হওয়া অবস্থায় সে আল্লাহর কাছে আরয করবে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের অগ্নিজিহ্বা ও তার উত্তাপ আমাকে পুড়ে ফেলেছে। আমার প্রতি বড় দয়া হবে যদি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে পাড়ে বসিয়ে দেন, যেন ক্ষণিকের জন্য হলেও আগুনের দহন থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, এরপরে আরও কিছু দাবী করবে না তো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আমি ওয়াদা দিচ্ছি, এরপর আমি আপনার কাছে কোনো কিছু দাবী করবো না। আল্লাহ বলবেন, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তারপর ওই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে জাহান্নামের পাড়ে বসিয়ে দেয়া হবে। জাহান্নামের পাড়ে ঠাঁই নেয়ার পর তার বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে আরও কিছু পাওয়ার আশা ঝিলিক দিয়ে উঠবে। সে পুনরায় ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! জাহান্নামের অগ্নিগর্ভ থেকে মুক্তি দিয়েছেন তো আপনিই। এটা আপনার করুণা। কিন্তু বসিয়েছেন এমন স্থানে, যেখানে জাহান্নামের অগ্নিজিহ্বা যথারীতি আমাকে লেহন করছে। যদি আমাকে সামান্য সময়ের জন্য এমন স্থানে জায়গা দিতেন, যেখানে জাহান্নামের উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বান্দা, তুমি তো সবেমাত্র বলেছিলে যে, আর কোনো কিছু চাইবে না। সে ওয়াদা কি তুমি লংঘন করছো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! বেশি নয় আমাকে এখান থেকে একটু দূরে নিয়ে যান। অঙ্গীকার করছি, এরপর আর কোনো কিছু দাবী করবো না।

আল্লাহ তা'আলা এবারও তার ফরিয়দ কবুল করবেন। তাকে এমন স্থানে স্থানান্তরিত করবেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে। কিছুক্ষণ পর তার চিন্তাশক্তি আরো প্রখর হয়ে উঠবে। ফরিয়াদ করবে,

হে আল্লাহ! সবই আপনার করুণা। আমাকে জাহান্নামের অগ্নিশিখা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমন স্থানে বসতে দিয়েছেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলী স্পষ্ট দেখা যায়। আমাকে আরেকটু সুযোগ দিন, যেন জান্নাতের দরজার কাছাকাছি যেতে পারি এবং জান্নাতটাকে একটু দেখে নিতে পারি। আহা! জান্নাত না জানি কেমন!

আল্লাহ বলবেন, বান্দা! তুমি কিন্তু আবারও অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি যখন একান্ত দয়া করে আমাকে এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন। তখন জান্নাতটাও অন্তত একনজর দেখতে দিন। আল্লাহ বলবেন, একনজর দেখতে দিলে তুমি তো বলবে, আমাকে একটু ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিন। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ আমাকে শুধু এক নজর দেখতে দিন, এরপর আর কিছুই বলবো না। তারপর মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতটা একনজর দেখার সুযোগ দিবেন। কিন্তু আল্লাহর জান্নাত এক ঝলক দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফরিয়াদ করে উঠবে, হে আল্লাহ! ইয়া আরহামার রাহিমীন। আপনি যখন আমাকে এত দয়া করেছেন, এবার আরেকটু দয়া করুন। মেহেরবানী করে এর ভেতরেও প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখ বান্দা! প্রথমেই বলেছিলাম তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে। কিন্তু আমার অনুগ্রহে যখন তোমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, তখন তোমাকে আর নিরাশ করবো না। ভেতরেও প্রবেশ করাবো। আর সেখানেও তোমাকে গোটা পৃথিবীর সমান এলাকা দান করবো। বান্দা বলবে, আল্লাহ গো! ওগো আরহামুর রাহিমীন! ওগো দয়ার সাগর! করুণার আধার! আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? এও কী সম্ভব? আমার মত নগণ্য গোলাম এত বিশাল জান্নাতের অধিকারী হবো কেমন করে? আল্লাহ বলবেন, আমি কারো সঙ্গে ঠাট্টা করি না। সত্যিই আমি তোমাকে এমন জান্নাত দান করলাম।

'মুসালসাল বিযৃযিহ্ক' হাদীস

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীসটি বলার সময় হেসে ফেলেছিলেন। তারপর যেসব সাহাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তাঁরাও নিজেদের শিষ্যদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হেসে ফেলতেন। তারপর সেই শিষ্যগণও তাদের শিষ্যদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করার সময় হাসেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যখনই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন তারা হাসেন। যারা তাদের কাছ থেকে হাদীসটি শোনেন, তারাও হাসেন। যার কারণে এ হাদীসকে 'মুসালসাল বিযৃযিহ্ক' হাদীস বলা হয়।

গোটা পৃথিবীসমান জান্নাত

এ হলো সকলের পরে যে জান্নাতে যাবে, তার জান্নাত। দেখুন, তার জান্নাতটাও হবে এ বিশাল পৃথিবীর সমান। কাজেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতির জান্নাত না জানি কেমন হবে? কত বিশাল হবে! আসলে আমরা তো এ পৃথিবীর চৌহদ্দিতে পড়ে আছি। পরকালের কোনো বাতাসও আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। তাই ওই জগত সম্পর্কে যথাযথ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে যখন আমরা শুনি, এ পৃথিবীর সমান হবে একজন নিম্নস্তরের বেহেশতির জান্নাত, তখন আমরা তাজ্জব বনে যাই। ভাবি, যদি সে এ বিশাল জান্নাত পেয়েও বসে, তাহলে এ দিয়ে করবেটা কী? এর কারণ মূলত আমরা ওই জগত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই।

পরজগতের উপমা

পরকালের তুলনায় আমাদের অবস্থা তো মায়ের পেটে অবস্থানরত শিশুর মতই, যার গায়ে এ পৃথিবীর বাতাস এখনও স্পর্শ করেনি। সে নিজের মাতৃগর্ভকেই মনে করে সবকিছু। তারপর যখন পৃথিবীতে আসে, তখনই টের পায় এ পৃথিবীর তুলনায় তার মায়ের গর্ভ কতটা সংকীর্ণ ও ছোট ছিলো। আল্লাহ তা'আলা যদি নিজের সন্তুষ্টিসহ দয়া করে সেই জগতটা দান করেন, তাহলে বুঝতে পারতো কত বিশাল সুপ্রশস্ত ও প্রাচুর্য্যময় সে জগত। সে জগতটা মুমিনদের জন্যই।

জান্নাত শুধু তোমাদের জন্য

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' জান্নাত মুমিনদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ঈমানদারই হবে জান্নাতের অধিকারী। তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে বাস্তবেই বিশ্বাস করে থাক, তাহলে এও বিশ্বাস কর যে, জান্নাত শুধু তোমাদের জন্য। তবে তাতে প্রবেশের জন্য কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিছু রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে। কিছু কাজ করতে হবে। ওই কাজগুলো করো। তবেই তোমরা তোমাদের জন্য তৈরিকৃত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা করুণা করে আমাদেরকে জান্নাত নসিব করুন। আমীন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং আখেরাত ভাবনা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) ছিলেন একজন উচুস্তরের তাবিঈ। ছিলেন একজন বড় মাপের ওলী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর শিষ্য। তাঁর বক্তব্য—

একবার আমি আমার ওস্তাদ হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিলো জুমার দিন। তিনি কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা করলেন। সদাই-পাতি করলেন। ফেরার পথে আমাকে বললেন, সাঈদ! আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারেও এভাবেই একত্রিত করুন। দেখুন! এ হলো সাহাবায়ে কেরাম। তাদের সার্বক্ষিণক ভাবনাই ছিলো আখেরাতকে ঘিরে। সামান্য প্রসঙ্গ এলেই তাঁরা আখেরাতের ভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এ চেতনা তাদের মাঝে ছিলো সদাজাগ্রত। তাঁরা সজাগ থাকতেন, যেন পার্থিব কাজ-কর্ম আখেরাত থেকে তাদেরকে গাফেল না করে ফেলে। মানুষ সাধারণত পার্থিব কাজ-কর্মের ঘোরে পড়েই আখেরাতের জীবনকে ভুলে যায়। হযরত আবু হুরায়রাকে দেখুন! দুনিয়ার কাজ তথা বাজার-সদাই করছেন এবং এরই ভেতরে নিজের জন্য ও শিষ্যের জন্য দু'আ করছেন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের বাজারে গিয়ে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করেন।

জান্নাতের বাজার

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, জান্নাতেও বাজার হবে কি? কারণ, আমরা তো শুনেছি যে, সেখানে সবকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। আর বাজারে তো বেচা-কেনা হয়। আবু হুরায়রা (রা.) উত্তর দিলেন, জান্নাতেও বাজার বসবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, জান্নাতে বাজার বসবে প্রতি জুমু'আবারে। বাজারে বেহেশতিগণ উপস্থিত হবেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বেহেশতিগণ যখন নিজ-নিজ জান্নাতে চলে যাবে, সেখানের সুখ-আনন্দ ভোগ করতে থাকবে এবং সেখানে বর্ণনাতীত নেয়ামতে তারা আত্মহারা থাকবে। এমনকি সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। ইত্যবসরে একজন ঘোষক হঠাৎ ঘোষণা করবে, সকল বেহেশতিকে দাওয়াত করা হচ্ছে, তারা যেন নিজ নিজ জান্নাত থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে যান। এ ঘোষণা শোনার পর বেহেশতিগণ নিজ নিজ ঠিকানা থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে চলতে শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন মহা বিস্ময়কর কাণ্ড! নানা প্রকার মনোহর সামগ্রী সেখানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে, জীবনে যেগুলো তারা কখনও দেখেনি। তবে সেখানে কোনো ধরনের বেচা-কেনা হবে না, বরং ঘোষণা করা হবে, যার যেটা পছন্দ সে যেন তা তুলে নিয়ে যায়। তারপর বেহেশতিগণ বাজারের একপ্রান্ত

থেকে অপর প্রান্তে হেঁটে যাবে। তাদের জন্য অপেক্ষমান নানা বিস্ময় তারা দেখতে পাবে। যার যেটা পছন্দ হবে, সে সেটা নিজের মত তুলে নিয়ে যাবে।

জান্নাতে আল্লাহর দরবার

কেনাকাটা পর্ব শেষ হবার পর পুনরায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে, সবাই আল্লাহর দরবারে সমবেত হোন। ঘোষণা শোনার পর সকলেই সমবেত হবে মহান আল্লাহর মহান দরবারে। তখন তাদেরকে বলা হবে, আজকের এ দিনটি সেদিন, দুনিয়াতে জুমাবার হিসাবে যা তোমরা পেতে। এ দিনটিতে দুনিয়াতে তোমরা জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে সমবেত হতে। সেদিনের একত্র হওয়ার বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে জান্নাতেও একত্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো। আল্লাহর এ দরবারে সেদিন সকল বেহেশতির জন্য কুরসি পাতা থাকবে। দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে দাওয়াত দেয়া হবে। কারও কুরসি হবে মূল্যবান হীরা-জহরতের, কারও কুরসি হবে সোনার, কারও কুরসি হবে রুপার। সকলেই নিজের স্তর অনুযায়ী কুরসি পাবে। তবে প্রত্যেকের কাছে নিজের কুরসিটা এতটা মূল্যবান হবে যে, অপরের কুরসি দেখে অতৃপ্তির সামান্যতম আক্ষেপও তার মাঝে জাগ্রত হবে না। কেননা, জান্নাত মানেই আক্ষেপ, হতাশা, দুঃখ ও বেদনামুক্ত এক সুখময় পরিবেশ। জান্নাতে সবচাইতে নিম্নমানের মর্যাদার অধিকারী যারা হবে, তাদের কুরসিগুলোর চারপাশে মিশ্‌ক-আম্বরের টিলা নির্মিত থাকবে। এভাবে বেহেশতিগণ প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর দরবারের সূচনা হবে ইস্রাফিল (আ.)-এর কণ্ঠে কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তিনি এমন সুরে আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শোনাবেন যে, তাঁর সুর-মূর্ছনার কাছে পৃথিবীর সকল সুর-বাদ্য ও শিল্প মনে হবে একেবারে তুচ্ছ।

মিশ্‌ক ও জাফরানের বৃষ্টি

আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শোনানোর পর আকাশ ছেয়ে যাবে ঘন মেঘে। মনে হবে এখনই বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। বেহেশতিগণ মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ইতোমধ্যে শুরু হবে মিশ্‌ক ও জাফরনের বর্ষণ। কী স্নিগ্ধ, কী ঝিরঝিরে, কী মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়ানো বৃষ্টি – যা এ পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ কল্পনাও করেনি।

তারপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হবে। আলতোভাবে সে বায়ু সকলকে স্পর্শ করে যাবে। এতে সকলেই এক অন্যরকম সজীবতা ও প্রশান্তি অনুভব করবে। সেই সাথে তাদের চেহারা ও শরীরের সৌন্দর্য আরও ঝলমলিয়ে উঠবে। তাদের পূর্বের রূপ-গুণ আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলকে বেহেশতি পানীয় পরিবেশন করা হবে। পৃথিবীর কোনো পানীয়ের সঙ্গে সে পানীয়ের তুলনা চলে না।

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল্লাহর দীদার

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরাই বলো, দুনিয়াতে যে আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলাম তোমাদের ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়ে অমুক-অমুক নেয়ামত দান করবো, সে সকল নেয়ামত তোমরা বুঝে পেয়েছ, না-কি এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে?

তখন জান্নাতবাসী প্রত্যেকেই একবাক্যে বলবেন, হে আল্লাহ! যেসব নেয়ামত আপনি আমাদেরকে দান করেছেন, এর চাইতে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে? আপনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন পরিপূর্ণভাবেই। আমরা আমাদের প্রতিটি আমলের বিনিময় পেয়ে গেছি। এখন কোনো কিছুর প্রতি আমাদের আর আগ্রহ নেই। সব রকমের সুখ-শান্তি আমরা পেয়েছি, কামনা-বাসনার কিছু আমাদের মাঝে আর নেই। এরপরেও আর কী বাকি থাকতে পারে?

হাদীস শরীফে এসেছে, এখানেও ওলামায়ে কেরামের দরকার হবে। এ প্রশ্নের উত্তরের সময় সকলেই ছুটে যাবে তাঁদের নিকট। জানতে চাইবে– এমন কী নেয়ামত আছে, যা আমরা এখনও পাইনি? ওলামায়ে কেরাম জানাবেন, হ্যাঁ, এখনও একটি নেয়ামত বাকি আছে। তোমরা আল্লাহর দরবারে তাঁর দীদার প্রার্থনা করো। তখন সকল বেহেশতি একবাক্যে প্রার্থনা করে উঠবে, হে আল্লাহ! এখনও একটি মহান নেয়ামত আমরা পাইনি।

তা হলো আপনার দীদার। এ নেয়ামত এখনও বাকি আছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, একটি নেয়ামত এখনও তোমরা পাওনি। এখনই তোমাদেরকে এ নেয়ামত দিয়ে ধন্য করা হবে। এরপর সকলেই আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলের সামনে নিজের মহান সত্তাকে প্রকাশ করবেন। বেহেশতিদের কাছে এ সুমহান নেয়ামতের তুলনায় পূর্বের সকল নেয়ামত মনে হবে একেবারে নগণ্য ও তুচ্ছ। মনে হবে এটাই

হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। মহান প্রভুর দীদার লাভের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে এ দরবারের সমাপ্তি ঘটবে। তারপর সকলেই পৌছে যাবেন নিজ-নিজ ঠিকানায়।

রূপ-সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। বেহেশতি পুরুষগণ যখন নিজ-নিজ ঠিকানায় গিয়ে পৌছবেন, তখন তাঁদের স্ত্রী ও হুরগণ জিজ্ঞেস করবে, আজ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের চেহারার রূপ-লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। তোমরা এত রূপ-লাবণ্য কোথায় পেলে?

তখন তারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তোমরাও তো দেখি তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি রূপবতী ও লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠেছ! রূপের জৌলুস তো দেখি উপচে পড়ছে!

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, উভয় শ্রেণীর এ উপচানো রূপ-ও সৌন্দর্য মূলত ওই বাতাসের স্পর্শের কারণে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো।

সারকথা হলো, জান্নাতে জুমার দিন অনেক বিশাল সমাবেশ হবে। বাজার বসবে। আল্লারহ দীদার হবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই একান্ত করুণা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য নসিব করুন। আমীন।

জান্নাতের নেয়ামতসমূহ কল্পনাকেও হার মানাবে

আগেই বলেছি, পৃথিবীর কোনো ভাষা, শব্দ, ব্যাখ্যা কিংবা শিল্প দিয়ে জান্নাতের প্রকৃত দৃশ্য চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা, এক হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন–

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ

আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমনসব নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছি, যা আজ পর্যন্ত কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করতে পারেনি।

তাই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, জান্নাতের নেয়ামতসমূহের নাম দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের মতই থাকবে। যেমন সেখানে হরেক রকমের ফলমূল থাকবে, আনার থাকবে, খেজুর থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো স্বাদে, সুগন্ধিতে ও প্রকৃতিতে কেমন হবে দুনিয়ার মানুষ তা কল্পনা করতেও অক্ষম।

হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতে বড় বড় অট্টালিকা হবে। কিন্তু সেগুলোর সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব ব্যবস্থাপনা আমরা এ দুনিয়াতে বসে কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। হাদীস শরীফে আছে, জান্নাতে শরাব থাকবে, দুধ থাকবে, মধুর নহর থাকবে। কিন্তু সেগুলোর স্বাদ ও কমনীয়তা আমরা এ দুনিয়াতে বসে কল্পনাও করতে সক্ষম নই।

সেখানে ভয় কিংবা চিন্তা থাকবে না

জান্নাতের সবচে বড় নেয়ামত, যা দুনিয়ার জীবনে আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তাহলো সেখানে কোনো প্রকার ভয় কিংবা চিন্তা থাকবে না। দুঃখ, বেদনা, দুঃশ্চিন্তা, বিষণ্ণতার বিন্দুমাত্রও কাউকে সেখানে স্পর্শ করবে না। সেখানে অতীত নিয়ে কোনো টেনশন থাকবে না, ভবিষ্যত নিয়ে কোনো আশংকা থাকবে না। মূলত এটা এমন এক নেয়ামত, যা এ পার্থিব জগতে অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, এজগতকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে কোনো রস-আনন্দই পূর্ণতা লাভ করে না।

এখানে আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ ও দুঃখ, মজা ও চিন্তা একই সঙ্গে চলে। যেমন আপনি খানা খাচ্ছেন। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। মজাও পাচ্ছেন বেশ। কিন্তু সেইসঙ্গে মনের ভেতর এ দুশ্চিন্তাও জেগে আছে, যদি বেশি খাই, তাহলে বদহজম হতে পারে। কোনো পানীয় পান করছেন। সুস্বাদু ও কোমল পানীয়। কিন্তু পান করার সময় এ ভয়ও ইতিউতি করছে যে, গলায় আটকে যায় কিনা কিংবা ঠাণ্ডা লেগে যায় কিনা। অর্থাৎ এখানে প্রতিটা আনন্দের পেছনে একটা দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে ফেরে। এ যেন কখনই আলাদা হতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা, ভয়, আশংকা ও দুঃখ-বেদনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত রেখেছেন। সেখানে কেউ কোনো ভয় করবে না, দুশ্চিন্তা করবে না, আশংকা করবে না, দুঃখ-বেদনা পাবে না। সেখানে অতীত-ভবিষ্যত সবই সমান। কারও মনে বেদনার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও স্পর্শ করতে পারবে না। মনের প্রতিটি বাসনাই সেখানে পূর্ণতা পাবে।

দুনিয়াতে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের ঝলক

মূলকথা হলো, মানুষ বড়ই বাস্তবতাপ্রিয়। বাস্তবতা তার সামনে প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত সে অনেক বড়-বড় বিষয়কেও সংশয়যুক্ত মনে করে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের এমন ভাণ্ডার দান করেছেন, যা অন্য কোনো মানুষকে দান করেননি। তাঁরা আমাদেরকে জান্নাত ও

তার নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে অকাট্য সংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের সে সংবাদের চাইতে সুনিশ্চিত আর কোনো সংবাদ হতে পারে না। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (سورة آل عمران : ١٣٣)

আর তোমরা ধাবিত হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত হয়েছে মুত্তাকিনগণের জন্য। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৩)

জান্নাতের চৌহদ্দি কণ্টকাকীর্ণ

আজীমুশ্বান জান্নাত। তার নেয়ামতও আজীমুশ্বান। কিন্তু এ জান্নাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

انَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِه

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে অপছন্দনীয় বিষয়াবলী দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন।

অর্থাৎ– জান্নাতের পথ কঠিন। এপথে চলতে মানুষকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। যেমন– একটি সুউচ্চ অট্টালিকা যার চারিপাশে বিছিয়ে রাখা হয়েছে প্রচুর কাঁটা। এ নয়নাভিরাম অট্টালিকায় যদি কেউ পৌছতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই এ কাঁটাগুলো অতিক্রম করে যেতে হবে। এ ছাড়া সে এ সুরম্য মহলে প্রবেশ করতে পারবে না। মহলের ভোগ-বিলাসিতাও ভোগ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বিশাল জান্নাত নির্মাণ করে রেখেছেন। কিন্তু তার পথে প্রচুর কাঁটা, যে পথ অতিক্রম করা বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন– আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন জান্নাতে পৌছার জন্য। বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করতে এ কর্তব্যগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। অথচ সব কাম-কাজ ছেড়ে দিয়ে মসজিদে পৌছা এবং সেখানে গিয়ে নামায আদায় করা মানুষের জন্য কঠিনই বটে। অনুরূপভাবে এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলোর প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। যেমন– বলে দিয়েছেন, দৃষ্টিকে হেফাযত কর, পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দিও না। যদি তাকাও, তাহলে সেটা গোনাহ ও হারাম হবে। কিন্তু এসব কিছু মেনে চলা মানুষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। মন তাকে টানছে এসব কাজের প্রতি।

অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলো নিষেধ করে দিয়েছেন। এগুলোকেই হাদীসের ভাষায় 'কাঁটা' বলা হয়েছে। এই ধরুন, এক ব্যক্তি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আড্ডার আসর জমে উঠেছে। ইতোমধ্যে একজনের আলোচনা উঠলো। এখন মন চাচ্ছে তার গীবত করতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, গীবত করতে পারবে না। তোমার রসনাকে সংযত রাখ। এটাই হাদীসের ভাষায় 'কাঁটা'। জান্নাত লাভ করতে হলে মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এ কাঁটাগুলো অতিক্রম করতে হয়। এছাড়া জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

জাহান্নামের চারদেয়াল কামনার বস্তুসামগ্রী

আলোচ্য হাদীসেরই প্রথমাংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছে–

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ

'জাহান্নামকে আবৃত করে রাখা হয়েছে কামনার বিষয়াবলী দ্বারা।'

মন যা চায়, যা দেখতেও 'দারুণ' লাগে, যা দেখলে আকর্ষণ জেগে উঠে বিনা কারণেই, মানুষ সেসব জিনিস পেতে চায়। এগুলোকেই হাদীসের ভাষায় 'কামনার বিষয়াবলী' বলা হয়েছে।

এ সবকিছুই বিছানো রয়েছে জাহান্নামের চারিদিকে। এগুলো অতিক্রম করা সহজ। অথচ এর ভেতরেই রয়েছে শুধু আগুন আর আগুন।

কাঁটাও ফুল হয়ে যায়

জান্নাতের পথ কাঁটাবিছানো এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, কোনো ব্যক্তি যদি সাহস সঞ্চয় করে এ পথে পা বাড়ায় এবং এ কাঁটাগুলো অতিক্রম করে জান্নাত লাভ করতে চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাঁটাবিছানো এ পথকে ফুলবিছানো পথে রূপান্তরিত করে দেন। অর্থাৎ মানুষ যখন দূর থেকে দেখে, তখন এগুলোকে ভয়ংকর বাধা ও কাঁটা মনে হয়। মনে হয় যেন এগুলো অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যখন কেউ একটু সাহস করে এ পথ অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এ প্রতিজ্ঞা করে যে, এ পথ আমি অতিক্রম করবোই। যেভাবেই হোক এ পথ পাড়ি দেবো এবং এরপর যে মনোহারী মহল ও বাগান রয়েছে, সেখানে আমি প্রবেশ করবোই। তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এ কাঁটাগুলোকে ফুল বানিয়ে দেন।

এক সাহাবীর জীবনদান

এক সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাহে লড়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করলেন, শত্রুপক্ষ অত্য[illegible] ক্রমের সঙ্গে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাঁচার

কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। তখন তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বাক্যগুলো বেরিয়ে এলো–

غَدًا نَلْقَى الْاَحِبَّةَ – مُحَمَّدًا وَصَحْبَهٗ

অর্থাৎ– সময় চলে এসেছে। কালই আমরা আমাদের বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবো।

দেখুন আগুন ও রক্তের খেলা চলছে। লাশের পর লাশ ঝরে পড়ছে। রক্তের ভেতর কাতরাচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতিতে জীবন দেয়া কী চাট্টিখানি কথা! অথচ এ সাহাবীর কাছে এটা খুব কঠিন মনে হয় নি। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তখন তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা পিঁপড়ার দংশনের মতই তুচ্ছ মনে হয়। অর্থাৎ জান্নাতে পৌছার পথে বাধা ছিলো এ কাঁটাটাই। কেউ যদি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যায়, তখন এ কাঁটা তাঁর পথে আর বাধা হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ○ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

জীবন যাঁর তাঁকেই তো জীবন বুঝিয়ে দিলাম। বাস্তব কথা হলো, এরপরেও জীবনের হক আদায় হলো না।

বিছানায় পড়ে ধুঁকে-ধুঁকে মরার যন্ত্রণা কি ভাষায় চিত্রিত করা সম্ভব! কিন্তু শাহাদাতের মৃত্যু মানে মৃত্যুর এমন পথ, যেখানে এ করুণ যন্ত্রণাও সামান্য পিঁপড়ার দংশনের মত। এ জন্যই বলি, কোনো ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ কাঁটাবিছানো পথ অতিক্রম করবেই, তখন এ কাঁটাই তার কাছে ফুলের মত মনে হয়।

টিপ্পনীকে বরণ করে নাও

মূলকথা হলো, এ কাঁটাটা যদিও দূর থেকে কাঁটা মনে হয়, কিন্তু কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এটি জয় করার পদক্ষেপ নিলে তখন তার কাছে আর কিছুই মনে হয় না। আসলে আমরা চিন্তা করি নেতিবাচক চিন্তা। মনে করি দ্বীনের অমুক কাজটি করা কিংবা অমুক গুনাহটা ছেড়ে দেয়া বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাশাপাশি সমাজের কথাও মাথায় গিজগিজ করে। ভাবি, আমি যদি এটা করি, সমাজের মানুষ আমাকে মৌলবাদী বলবে। বলবে, তুমি তো দেখি একবারে সেকেলে। এ অধুনা সমাজে কী এসব চলে! এসব বলে মানুষ খোঁচা দিবে। তাই এ খোঁচার ভয়েই আমরা অগ্রসর হতে চাই না। মনে রাখতে হবে, মূলত এগুলোই বেহেশতের পথে কাঁটা। জান্নাতে পৌছতে চাইলে এসব টিপন্নীকে

বরণ করে নিতে হবে হাসিমুখে। বলতে হবে, হ্যাঁ, বাস্তবেই আমি মৌলবাদী, আমি সেকেলে। এমন সেকেলে যে, আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের প্রতি। যদি কেউ এভাবে স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজের খোঁচাকে বরণ করে নিতে পারে, তাহলে তার জন্য এসব কাঁটা ফুল হয়ে যাবে।

দ্বীনের পথেই সম্মান

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেন। একসময় এসব বিদ্রূপকারীদের কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে যায়। অবশেষে ইজ্জতের জিন্দেগী তারাই যাপন করে, যারা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুগতদের ভাগ্যেই মর্যাদা ও সম্মান জোটে। রাসূল (সা.)-এর যুগেও মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বলতো, আমরাই সম্মানিত। তোমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অর্থাৎ– মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত বলে তিরস্কার করতো।

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

(سورة المنافقون : ٨)

অর্থাৎ– সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।

ইবাদতে মজা পেয়ে যাবে

জান্নাতের পথ কাঁটাবিছানো অবশ্যই। কিন্তু এটা পরীক্ষার কাঁটা। নিকটে গেলে তা ফুল হয়ে যায়। তারপর এ 'কঠিন' ইবাদতই সহজ হয়ে যায়। এমনকি এতে অন্যরকম স্বাদ চলে আসে, যা দুনিয়ার বড়-বড় কাজেও পাওয়া যায় না। যেমন– রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

আমার চোখের প্রশান্তি নামাযে।'

গুনাহ ছাড়ার কষ্ট

গুনাহ ছাড়তেও একপ্রকার কষ্ট অনুভূত হয়। মনের মধ্যে একপ্রকার বাধা এসে হাজির হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কেউ গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি আমার কামনা-বাসনাকে আল্লাহর কাছে বিসর্জন দিবো, তাহলে

শুরুতে যদিও কিছুটা কষ্ট অনুভূত হয়; কিন্তু অবশেষে এ বিসর্জনের মাঝেই মজা চলে আসে। বান্দা যখন ভাবে, আমি আমার মালিকের জন্য নিজের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিচ্ছি, তখন এর মধ্যে যা আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মা সন্তান প্রতিপালনের কষ্ট সহ্য করে কেন?

এক মায়ের দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি নিজের শিশু-সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন। কনকনে শীতের রাত। লেপের ভেতর সন্তানকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এরই মধ্যে সন্তান পেশাব করে দিলো, পায়খানা করে দিলো। মা সঙ্গে-সঙ্গে গরম লেপ ছেড়ে উঠে যান। বাচ্চার ভেজা কাপড় বদলে দেন। আবার সেগুলো ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে দেন। কনকনে এ শীতের রাতে এতসব কাজ করা অবশ্যই কঠিন। মা এ কঠিন কাজগুলো করেন। তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি যখন ভাবেন, এ কষ্টটুকু তো আমার সন্তানের জন্যই, আমি আমার কলিজার টুকরার জন্য আমার সুখটুকু বিলিয়ে দিচ্ছি। তখন এ কষ্টের মধ্যেও তিনি এক প্রকার আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। এখন কেউ যদি তাকে বলে, এ বাচ্চার জন্য তোমার এত কষ্ট। শীত নেই, ঘুম নেই। এসবের মোকাবেলা করে তোমাকে সন্তান বড় করতে হচ্ছে। কাজেই সন্তানটিকে যদি তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তোমাকে আর এত কষ্ট পোহাতে হবে না। তখন মমতাময়ী মা উত্তর দিবেন, এ আর তেমন কী! এর চাইতে হাজারগুণ কষ্টও আমি আমার সন্তানের জন্য করতে প্রস্তুত। তবুও আমার বুক থেকে আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে দিবো না। মা কেন এ ধরনের উত্তর দিবেন? কারণ, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তাঁর অন্তরে গেঁথে আছে। তাই এর চাইতেও কঠিন কষ্টও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত।

অনুরূপভাবে বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখে, আল্লাহর সঙ্গে যখন তার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার জন্য একেবারে সহজ হয়ে যায়। কাঁটা তখন তার কাছে কাঁটা মনে হয় না, মনে হয় ফুল।

জান্নাত ও পরকালের ধ্যান করুন

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.) জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যেসব বিবরণ দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনেও যার আলোচনা পর্যাপ্ত এসেছে, সেসব নেয়ামত লাভের জন্য মানুষকে সাধনা করতে হবে। দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে জান্নাতের

চারপাশে বিছানো কাঁটা অতিক্রম করার। এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন একটি পদ্ধতিও আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন।

তাহলো, এ দুনিয়াতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে কল্পনা করবে, ধ্যান করবে। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, প্রতিজন মুসলমানের উচিত দিনের সামান্য সময় বের করে হলেও পরকালের ধ্যানের জন্য নির্ধারিত করে নেয়া। জান্নাত ও জান্নাতের সমূহ নেয়ামতের কথা কল্পনা করা। একে বলা হয় মুরাকাবা। অর্থাৎ এভাবে ধ্যান করা– আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাকে কবরে রাখা হচ্ছে, আমাকে দাফন করে সকলেই চলে যাচ্ছে, আমি এখন একা বরযখের জগতে চলে এসেছি। পরকাল জগত শুরু হয়ে গেছে। হিসাব-নিকাশ হচ্ছে। মিজানের পাল্লা স্থাপন করা হয়েছে। পুলসিরাত তৈরি করা হয়েছে। একদিকে জান্নাত অপরদিকে দোযখ। জান্নাতে অগণিত নেয়ামত প্রস্তুত করা হয়েছে। জাহান্নামে করুণ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে নীরবে, নির্জনে কিছু সময় বসে পরকাল নিয়ে ধ্যান করবে। কারণ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা এ জগত নিয়ে মেতে থাকি। ফলে পরকালের কথা ভুলে যাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন আমাদেরকে চলে যেতে হবে। পরকালের মুখোমুখী আমাদেরকে সকলকে নিশ্চিতভাবে হতে হবে। কিন্তু এ বিশ্বাসটুকুই আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সেইসঙ্গে পরকালের ধ্যান করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য জাগানিয়া ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক বিষয়গুলো বারবার স্মরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই এ ধ্যান করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আখেরাতের ভাবনা

"আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র। সেখানকার প্রতিটি শিশুও শিক্ষিত। অর্থ-প্রাচুর্য সেখানে থৈ-থৈ করছে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি ঝুমঝুম করছে। পুলিশ সর্বদা সজাগ ও সতর্ক। কিন্তু এমন সভ্য দেশের অবস্থা হলো এই -সেখানকার সভ্যদের মুখে আমাকে এ উপদেশ শুনতে হয়েছে, আপনি যখন বাইরে যাবেন, দয়া করে হাতঘড়িটা লুকিয়ে রাখবেন। ভালো হবে যদি পকেটে টাকা-পয়সা খুব সামান্য রাখেন। কারণ, যে কোনো মুহূর্তে আপনি ছিনতাইকারীর কবলে পড়তে পারেন। এমনকি এ তুচ্ছ বস্তুর জন্য তারা আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এটা কোনো কাল্পনিক গল্প বলছি না। এসবই আমাকে শুনতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে। মূলত যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীর মানুষগুলো নিজেদের অন্তপ্রাণকে আখেরাতের আলো দ্বারা আলোকিত করে না তুলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী এ করুণ দৃশ্যকেই মেনে নিতে হবে।"

আখেরাতের ভাবনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ وَالاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى ○ (سورة الأعلى : ١٦-١٧)

اٰمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও; অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

আমাদের একটি ব্যাধি

আমি আপনাদের সামনে সূরা আ'লার দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এটা পবিত্র কুরআনের মুজিযা। তার ছোট্ট একটি আয়াত আপনি নিন। শব্দশরীরে আয়াতটি হয়ত মনে হবে খুবই ছোট্ট। কিন্তু মর্মবিচারে তার অর্থ হবে ব্যাপক ও গভীর। যদি কেউ তার অন্তপ্রাণে পৌঁছতে চায়, তাহলে এ আয়াতটিতেই হয়ত গোটা মানবজাতির জীবনদর্শন পাওয়া যাবে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের কথাই ধরুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদের একটি মৌলিক ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, এ মৌলিক ব্যাধিটি তোমাদের মাঝেই পাওয়া যায়। এটি এমন এক ব্যাধি, যা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পতন ডেকে আনতে সক্ষম। এখানে আল্লাহ তা'আলা ব্যাধিটি চিহ্নিত করার পাশাপাশি তার চিকিৎসাও বলে দিয়েছেন। তাও খুবই সংক্ষিপ্ত। এক আয়াতে ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। অপর আয়াতে তার চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। বলেছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○

তোমাদের মৌলিক ব্যাধি হলো, তোমরা সবক্ষেত্রে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। এ জীবনকে কেন্দ্র করে তোমরা সবকিছু চিন্তা কর। মরণের পর যে বিশাল জীবন রয়েছে, তার উপর এ জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাক। এটা তোমাদের একটি মৌলিক ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা কী?

ব্যাধির চিকিৎসা

এর চিকিৎসা হলো এই যে, পার্থিব জীবন, যার জন্য তোমরা রাত-দিন ছোটাছুটি করছো, অবিরাম চেষ্টা-তদবির চালাচ্ছো। এসবের পেছনে একটাই স্বপ্ন– পার্থিব জীবনের সুখ, আমার বাড়িটা যেন চমৎকার হয়। আমার হাতে যেন প্রচুর টাকা-পয়সা থাকে। দুনিয়াতে যেন আমি সম্মানিত হতে পারি। লোকে যেন আমাকে চেনে। আমার সুনাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি যেন বড় পদ লাভ করতে পারি। এসব চিন্তা-ভাবনাই সবসময় আমাদের ঘিরে রাখে। কিন্তু কখনও কি ভেবেছি, যে জীবনের জন্য আমাদের এত দৌড়ঝাঁপ, যার জন্য আমরা হালাল-হারাম একাকার করে ফেলেছি, হাজারও বিবাদ তৈরি করে রেখেছি, সেই জীবনটার মেয়াদ কতটুকু? সে জীবনটা ক'দিনের?

আখেরাতের জীবনের তুলনায় এ জীবনটা কতটুকু এবং কতটা উত্তম? আখেরাতের জীবনটা কি এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ ও সীমাহীন নয়?

কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়

ভালোভাবে বুঝে নিন, এ পৃথিবীর কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়। এখানকার প্রতিটি সুখের সঙ্গেই রয়েছে বেদনার আঘাত। দুঃশ্চিন্তা, সন্দেহ, সংশয় কিংবা আশংকা এখানের প্রতিটি আনন্দের পেছনেই রয়েছে। যেমন সামনে খাবার পড়ে আছে, পেটে ক্ষুধাও আছে। কিন্তু এমন একটা চিন্তা মাথায় ঘুরছে, যার কারণে খাবারে মন বসে না। সুস্বাদু খাবারও তখন বিষ মনে হয়। মানুষ মনে করে, বিপুল অর্থের নাম সুখ। কিন্তু একটিবার ধনকুবেরদের জীবনটা তলিয়ে দেখুন, আপনি সত্যিই হতাশ হবেন। দৃশ্যত তাদেরকে খুবই ফিটফাট মনে হয়। দামী গাড়ী, সুরম্য অট্টালিকা, চাকর-বাকরসহ ভোগ বিলাসের কোনো অভাব নেই।

এতসবের পরেও কিন্তু বেচারা ধনীর রাতের ঘুম হারাম। ঘুমের জন্য তাকে ট্যাবলেট খতে হয়। ডাক্তার তাকে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়ান। আরামদায়ক বিছানা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। অথচ এর বিপরীতে একজন দিনমুজুরকে দেখুন। তার কাছে ভালো একটি মশারি নেই। আয়েশী বিছানাও নেই। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করে সে যখন বাড়িতে এসে মাথার নিচে হাত রেখে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে, তখনি ঘুমের জগতে হারিয়ে গেছে। দীর্ঘ আট ঘন্টা কেটে গেছে অবিরাম ঘুমে। এবার আপনিই বলুন, সম্পদের কুমিরের নির্ঘুম রাতটা ভালো কাটলো, না এ দিনমুজুরের? আসল ব্যাপার হলো, এ দুনিয়াটাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানকার কোনো আনন্দই পূর্ণতা পায় না। প্রতিটি সুখের সঙ্গে মিশে থাকে দুঃখের কাঁটা।

তিন জগত

জগত মোট তিনটি। একটি হলো সুখ ও আনন্দের জগত। দুঃখ-বেদনা, ব্যথা-দুঃশ্চিন্তা কিংবা সন্দেহ-সংশয়ের ছিঁটে-ফোটাও সেখানে নেই। সেখানে কেবলই সুখ, কেবলই ভোগ ও আনন্দ। এ জগতের নাম জান্নাত। এরই বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা আরেকটি জগত সৃষ্টি করেছেন। সেখানে শুধু দুঃখ-বেদনা আর শংকা ও হতাশা। রস-আনন্দ কিংবা সুখ-ভোগের ছোঁয়াও সেখানে নেই। এ জগতটার নাম জাহান্নাম।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় আরেকটি জগত সৃষ্টি করেছেন, যার নাম দুনিয়া। এখানে সুখও আছে, দুঃখও আছে। আবার সঙ্গে হতাশাও আছে। তৃপ্তির সঙ্গে অভাবও আছে। এখানে এসবই হাত ধরাধরি করে চলে। সুতরাং কেউ যদি আশা করে, এ দুনিয়াতে আমি থাকব; কিন্তু দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত থাকবো। আমার মনের বিপরীতে কিছুই ঘটবে না। তাহলে বুঝতে হবে দুনিয়াটাই সে বোঝেনি। কারণ, এখানে এটা সম্ভব নয়। ভাবনার বিষয় হলো, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তাঁরাও এ পৃথিবীতে এসে নানা রকম কষ্ট-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। দুঃশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে নির্ঘুম রাত তাঁদেরকেও কাটাতে হয়েছে। অথচ এ পৃথিবীতে কেবল সুখের জীবন কাটানো যদি কারো পক্ষে সম্ভব হতো, এটা একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামের হতো। কারণ, তাঁরাই আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। অথচ আমরা দেখি, দুঃখ-বেদনা ও দুঃশ্চিন্তার কালোমেঘ তাঁদেরকেও আজীবন ঘিরে রেখেছিলো, এমনকি এ মহান কাফেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেছেন–

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ

এ পৃথিবীতে সর্বাধিক বিপদের মুখোমুখী হন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তারপর যাঁরা তাঁদের অতি নিকটতম। এরপর যাঁরা তাঁদের অতি নিকটতম।'

আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি, তাহলো, এ পৃথিবীর কোনো সুখই পরিপূর্ণ নয়। এখানকার কোনো রস-আনন্দকেই পরিপূর্ণ বলা যাবে না। এখানকার কোনো শান্তিই স্থায়ী নয়। এখন সুখে আছি সুতরাং আগামীকালও সুখে থাকবো- এ দাবী কেউ করতে পারবে না। এমনত হতে পারে, এখন সুখে আছি, কিন্তু এক ঘন্টা পরেই দুঃখের ভেতরে ডুবে যাবো।

আখেরাতের আনন্দ পরিপূর্ণ আনন্দ

আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য হলো, আখেরাতের জীবনই উত্তম জীবন। সেখানকার ভোগ-আনন্দই পরিপূর্ণ।

এক হাদীসের মর্মার্থ অনেকটা এরকম– এ পৃথিবীতে তোমার কাছে কোনো খাবার ভালো লাগলে যত খুশি তত খেতে পারবে না। পেট ভরে যাবে তাই খেতে পারবে না। আবার অনেক সময় রুচিতেও কুলোবে না। তখন সে খাবারে আর হাত দিতেও ইচ্ছে করবে না। অর্থাৎ– আকর্ষণীয় খাবারটি তোমার কাছে একটু পরেই বিকর্ষণীয় হয়ে গেলো। এখন এক প্লেট খাবারের বিনিময়ে হাজার টাকা পুরস্কার দিলেও তুমি খাবে না। কারণ, তোমার প্রয়োজন ও চাহিদা মিটে

গেছে। কিন্তু আখেরাতে যখন কারো সামনে খাবার পরিবেশিত হবে, সেখানে এ জাতীয় বিস্বাদ কিংবা অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে না। খেতে খেতে উদর পুরে গেলেও তার স্বাদ ও আকর্ষণে একটুও কমতি আসবে না। কোনোকালেও তার আগ্রহ শেষ হবে না। কারণ, সেখানকার স্বাদ চিরস্থায়ী, এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, পরকাল উত্তম। পরকালীন জীবনটাই টেকসই জীবন। দুনিয়ার জীবন অধম ও ক্ষণস্থায়ী। অথচ এতদসত্ত্বেও এ দুনিয়ার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এতটাই প্রবল যে, তোমরা আখেরাতের উপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। আকণ্ঠ ডুবে থাক এরই নেশায়। ফলে আখেরাতের কথা তোমাদের মনে থাকে না।

মৃত্যু সুনিশ্চিত

এ পৃথিবীতে সকলকেই মরতে হবে– একথাটা যতটা সুনিশ্চিত ও সর্বজনবিদিত, অন্য কোনো কথা এতটা সুনিশ্চিত ও সর্বজনস্বীকৃত নয়। কী মুসলিম কী অমুসলিম বরং মানুষমাত্রই বিশ্বাস করে একদিন তাকে মরতে হবে। মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ মরণকে অস্বীকার করেনি। মৃত্যু সম্পর্কে বড়-বড় নাস্তিক ও খোদাদ্রোহীরও মতভিন্নতা নেই। বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌছেছে। মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নেমেছে। কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। এমনকি কৃত্রিম মানুষ রোবটও বানিয়েছে। কিন্তু এসব বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার সামনে যে মানুষটি বসে আছে, সে আর কতদিন বাঁচবে? এখানে এসে সকল আবিষ্কার, সব বিজ্ঞানই ফেল। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই, এ সহজ কথাটা যতটা সুনিশ্চিত এবং তার আগমনটা যতটা অনিশ্চিত, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা তার চেয়ে বেশি।

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাবার আগ পর্যন্ত আমরা কী নিয়ে ভাবি? আমরা ভাবি, আমাদের দুনিয়াদারির কথা। পেশাগত কাজ-কর্মের কথা। ভাবি চাকরির কথা, ব্যবসা বাণিজ্যের কথা, ক্ষেত-খামারের কথা। মাথা-মুণ্ডু আরো কত কী ভাবি! কিন্তু একথা কি ভাবি যে, আমাকে একদিন কবরে যেতে হবে? সেখানে কী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে?

হযরত বাহলুলের ঘটনা

বাহলুল ছিলেন একজন মজনু ধরনের বুযুর্গ। তাই তাকে 'মাজযুব বাহলুল' বলা হতো, তবে কথা ছিলো তার পাণ্ডিত্যে ভরা। এ কারণে মানুষ তাকে জ্ঞানী বাহলুল'ও বলতো। তিনি মজনুও ছিলেন, পাণ্ডতও ছিলেন।

তখন ছিলো বাদশাহ হারুনুর রশীদের যুগ। বাহলুলের সঙ্গে বাদশাহ অনেক সময় রসিকতা করতেন। তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, বাহলুলের জন্য আমার পথ খোলা। যখনই সে আসতে চাইবে, বাধা দিবে না। বরং সোজা আমার কাছে পৌছে দিবে।

একদিনের ঘটনা। বাদশাহর হাতে একটি ছড়ি ছিলো। তিনি রসিকতা করে সেটি বাহলুলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এ ছড়িটি আমি তোমার কাছে আমানত হিসাবে রাখছি। এ পৃথিবীতে তোমার চাইতে বোকা কাউকে পেলে তাকে আমার পক্ষ থেকে ছড়িটি উপহার দিয়ো। মূলত এখানে বাদশাহ বাহলুলকে বোঝাতে চেয়েছেন, বাহলুল, এ পৃথিবীতে তুমি সবচেয়ে বড় বেকুব। বাহলুল ছড়িটা নিজের কাছে রেখে দিলো। কথাবার্তা চলছে, আসা-যাওয়াও চলছে। ইতোমধ্যে কয়েক বছর, কয়েক মাস কেটে গেলো। একবার বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শয্যাশায়ী বাদশাহ চলাফেরাও করতে পারছেন না। চিকিৎসকগণ বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

সংবাদ পেয়ে দরবেশ বাহলুল বাদশাহকে দেখতে ছুটে এলো। বললো, আমীরুল মুমিনীন, কী খবর? বাদশাহ উত্তর দিলেন, বাহলুল, খবর আর কী? সামনে দীর্ঘ সফর। বাহলুল বললো, কোথায় যাবেন আমিরুল মুমিনীন? বাদশাহ বললেন, আখেরাতের সফর। বাহলুল বললো, আচ্ছা! তাহলে নিশ্চয় সেখানে অনেক সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন। তাঁবুর ব্যবস্থাও করেছেন। বাদশাহ বললেন, বাহলুল! তুমি তো দেখি আজব কথা বলছো। এটা এমন সফর যে, এখানে তাঁবু কিংবা সৈন্য-সামন্তের ব্যবস্থা করা যায় না। বাহলুল বললো, আচ্ছা! তাহলে ফিরছেন কবে? বাদশাহ বললেন, তুমি এ কেমন কথা বলছো? এ সফর থেকে কেউ কি কোনো দিন ফিরে আসে? বাহলুল বললো, তবে তো এটা অনেক দীর্ঘ সফর। এ সফরে তাঁবুর ব্যবস্থা করা যায় না, বডিগার্ডের ব্যবস্থাও করা যায় না। বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ বাহলুল! এই সফর এমনই।

বাহলুল বললো, তাহলে শুনুন। আপনি অনেক দিন আগে আমার কাছে একটি আমানত রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ পৃথিবীতে আমার চাইতে বোকা কাউকে পেলে তাকে যেন ওই আমানতটা আপনার পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ দেই। আজ আমার মনে হলো, উপহারটির সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিজেই। কারণ, আমি জীবনে বহুবার দেখেছি, আপনার একটি ছোট্ট সফরেও অনেক সৈন্য-সামন্তকে আপনার আগমনী বার্তা নিয়ে পাঠাতেন। তারা আপনার পথ তৈরি রাখতো। পথে-পথে তাঁবু তৈরি করে আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতো। অথচ আজ আপনি যে দীর্ঘ সফরে যাচ্ছেন, তার জন্য এরূপ

কোনো ব্যবস্থা করেননি। তাই আমার কাছে আপনার চাইতে বোকা দ্বিতীয় কাউকে মনে হয় না। সুতরাং নিন, এ ছড়িটির উপযুক্ত আপনিই।

বাহলুলের কথা শুনো বাদশাহ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি মনে করতাম, তুমি একজন মজনু। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম তোমার চেয়ে বড় বুদ্ধিমান কেউ নেই।

মরণকে স্মরণ করুন

এটা বাস্তব সত্য যে, এ পৃথিবীতে ছোট একটি সফরেও মানুষ কত রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ওই সফর সম্পর্কে বারবার আলোচনা করে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু আখেরাতের সফর সামনে চলে এলেও আমাদের মনে কোনো অনুভূতি জাগে না। এ পৃথিবীতে মানুষ এমনভাবে জীবন কাটাতে থাকে যে, দেখে মনে হয় তাকে ছাড়া পৃথিবী নামক গাড়িটি চলবে না, আমি না থাকলে সন্তানদের অবস্থা কী হবে? আমার স্ত্রীর কী হবে? ব্যবসা-বাণিজ্যের কী হবে? আরও কত চিন্তা। অথচ এরই মধ্য দিয়ে যে আখেরাতের সফর একেবারে কাছে চলে এসেছে– একথা ভাবতেও প্রস্তুত নই আমরা। নিজের হাতে কত জানাযা কাঁধে নিচ্ছি, প্রিয়জনকে কবরে শুইয়ে দিচ্ছি, কবরের উপর মাটি বিছিয়ে দিচ্ছি, তারপর সেখান থেকে এমনভাবে চলে আসি, মনে হয় যেন এটা একান্ত তার ব্যক্তিগত ঘটনা। এ মরণ ও কবরের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঁ.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত্যু নামক ধ্রুব সত্যকে স্মরণ করো, যা সকল স্বাদকে নিঃশেষ করে দেয়।

কিন্তু আমরা যদি নিজেদের হিসাবটা কষে দেখি, তাহলে কী পাবো? কতটুকু সময় ব্যয় করি মরণের কথা স্মরণ করে? মূলত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মৌলিক ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বলে দিয়েছেন, আমাদের মূল ব্যাধিটা হলো আমরা আখেরাত সম্পর্কে গাফেল। তাই আমাদেরকে বারবার মরণের চিন্তা করার জন্য বলা হয়েছে। বাস্তবেই যদি আমরা মরণের স্মরণকে সতেজ রাখি, তাহলে জীবনের সকল সমস্যা কেটে যাবে। অন্যায়-অত্যাচার অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার যে ঝড় চলছে, তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে।

এ পৃথিবীর বুকে রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের মাঝে মূলত এ চিন্তাটাকেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ চিন্তার কারণেই তৎকালীন পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার সমৃদ্ধ হতে পেরেছিলো। সীরাতের কিতাবাদিতে তৎকালীন পৃথিবীর যে শান্তির চিত্র চিত্রিত হয়েছে, তা মূলত এ আখেরাত ভাবনারই ফসল। মানুষের মনে যখন জান্নাতের চিন্তা ও দৃশ্য তার চোখের সামনে প্রতিভাত থাকে, তখন সে প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথাই ভাবে।

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)। অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতাপে সমকালীন পরাশক্তি কাইসার ও কিসরা থরথর করে কাঁপতো। মহান এই খলিফা সফরে বেরিয়েছিলেন। পরনে ধুলোমলিন কাপড়। বুঝার উপায় নেই ইনিই অর্ধপৃথিবীর শাসক। পথ চলতে-চলতে তাঁর পাথেয় ফুরিয়ে গেলো। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেলো। সেকালে তো পথেঘাটে হোটেল-রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা ছিলো না। ক্ষুধার জ্বালায় যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন দেখলেন বকরির একটি পাল। তাই ভাবলেন, বকরির মালিকের কাছ থেকে কিছু দুধ চেয়ে নিয়ে পান করা যায়। কাছে গিয়ে দেখলেন, একজন লোক বকরিগুলো চরাচ্ছে। তাকে বললেন, আমি একজন ক্ষুধার্ত মুসাফির। আমাকে একটু দুধ দাও, তুমি চাইলে তার মূল্য দিয়ে দেবো। লোকটি উত্তর দিলো, জনাব, আমি আপনাকে দুধ অবশ্যই দিতাম। কিন্তু সমস্যা হলো বকরিগুলোর মালিক আমি নই। আমি একজন রাখালমাত্র। সুতরাং আমি আমার মালিকের অনুমতি ছাড়া আপনাকে দুধ দিতে পারবো না। এ অধিকার আমার নেই।

হযরত উমর (রা.) শুধু শাসকই ছিলেন না, তিনি একজন শিক্ষক ও মুরুব্বিও ছিলেন। তিনি যখন ঘুরতে বের হতেন, তখন তাঁর প্রজাদেরকে পরীক্ষা করতেন। ভাবলেন, এ রাখাল ছেলেটিরও পরীক্ষা নেয়া যাক। তাই তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৎস! এক কাজ করো, এতে তোমারও লাভ হবে আমারও ফায়দা হবে। রাখাল বললো, আমাকে আপনি কী করতে বলছেন? উমর (রা.) বললেন, তুমি আমার কাছে একটা বকরি বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে তার মূল্য দিয়ে দেবো। বকরিটা আমি নিয়ে যাবো। তার দুধ পান করবো। প্রয়োজনে জবাই করেও খেতে পারবো। আর তুমি তার মূল্য পেয়ে যাবে। মালিক এসে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলে দেবে, বাঘ খেয়ে ফেলেছে। ব্যস, তোমারও লাভ আমারও লাভ। তুমি পাবে টাকা আর আমি পাবো ছাগল।

উমর (রা.)-এর উক্ত প্রস্তাব শুনে রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে সজোরে বলে উঠলো–

يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللهُ

হে মিয়া! তবে আল্লাহ গেলেন কোথায়?

হযরত উমর মূলত ছেলেটিকে যাঁচাই করতে চেয়েছিলেন। ছেলেটি পাস করে ফেললো। তাই উমর (রা.) তাকে বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন এ উম্মতের মাঝে পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ ও সফলতা তাদের পদচুম্বন করবে।

হযরত উমর (রা.)-এর আরেকটি ঘটনা

জনগণের অবস্থা দেখা-শোনার জন্য হযরত উমর (রা.) মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতেন। একরাতের ঘটনা। তখন রাত প্রায় শেষ। একটি ঘরের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। ঘরের ভেতর থেকে দুজন নারীর আওয়াজ আসছিলো। উমর (রা.) লক্ষ্য করে শুনলেন, একজন মা অপরজন মেয়ে। মা মেয়েকে বলছে, দুধ দোহনের সময় হয়েছে। আজকাল আমাদের গাভিটা দুধও কম দেয়। আজকের দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে দিও। মেয়ে বললো, মা, দুধের সঙ্গে পানি মেশাবো কেমন করে? আমিরুল মুমিনীন উমর (রা.) তো নিষেধ করেছেন। মা বললো, হ্যাঁ আমিরুল মুমিনীন বলেছেন বটে। কিন্তু তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই। আমি যে দুধের সঙ্গে পানি মেশাচ্ছি, তা তো তিনি দেখছেন না। তিনি তো এখন বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন। মেয়ে বললো, মা, ঠিক আছে, আমিরুল মুমিনীন হয়ত বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন। তিনি হয়ত আমাদের এ দুর্নীতি দেখবেন না। কিন্তু আমিরুল মুমিনীনের মালিক তো দেখছেন। তিনি যখন দেখছেন, তখন আমি দুধের সঙ্গে পানি মেশাবো কী করে?

হযরত উমর (রা.) বাইরে দাঁড়িয়ে মা-মেয়ের কথোপকথন শুনছেন। ফজর নামাযের পর মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। তারপর তাকে ডেকে এনে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাঁরই গর্ভের গর্বিত ফসল ছিলেন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.), যিনি 'দ্বিতীয় উমর' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

আখেরাত ভাবনা

এটাই আখেরাত-ভাবনার সোনালী চিত্র। মূলত আল্লাহ তা'আলা চান আমাদের অন্তরে এ ভাবনাটাই সদা প্রবল ও বলীয়ান থাকুক। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে– আখেরাতের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। এ চিন্তা যদি মানুষের অন্তরে পরিপূর্ণ শক্তিমত্তা নিয়ে টিকে থাকে, তাহলে সে আর কোনো অন্যায় কাজে হাত-পা চালাবে না। সে চিন্তা করবে যে, আমাকে গড়তে হবে আমার আখেরাত। আমাকেই আমার জান্নাত প্রস্তুত করতে হবে। যে কোনো মূল্যেই আমাকে আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে হবে। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজে হাত দেয়ার সুযোগ আমার নেই। জীবনে কত মানুষকে মরতে দেখলাম। কত মানুষকে কবরের ঠিকানায় চলে যেতে দেখলাম। একদিন তো আমার পালাও এসে যাবে। কবরের আযাবের বিবরণ আল্লাহর রাসূল (সা.)

আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছেন। কবরের পরের জীবনটা কত দীর্ঘ তার আলোচনাও কুরআন-হাদীসে এসেছ। কিন্তু আমরা তো সে কথাগুলো ভাবি না। ভাবি শুধু দুনিয়ার কথা।

আখেরাতের ভাবনা যেভাবে সৃষ্টি হয়

এখন প্রশ্ন হলো–

পার্থিব জীবনের এ তীব্র চিন্তাকে আমরা স্তিমিত করবো কীভাবে? আমাদের অন্তরে আখেরাতের ভাবনাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করে তুলবো? মরুভূমির এক রাখালের অন্তরে যে পবিত্র ভাবনা সমুজ্জ্বল ছিলো, যে স্নিগ্ধ চিন্তা এ আরব্য তরুণীর অন্তরে বিরাজমান ছিলো, সে চিন্তাকে আমরা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করবো কিভাবে?

এর পথ একটিই। যাদের অন্তরে আখেরাত-ভাবনার প্রাচুর্য আছে, যাদের হৃদয়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি আছে, তাদের সংস্পর্শ গ্রহণ কর। তার কাছে আসা-যাওয়া কর। তার পাশে বস। তার কথাগুলো শোনো। এভাবেই তোমার অন্তরে আখেরাতের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংস্পর্শই মূলত সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে বদলে দিয়েছিলো। এরাই তো এক সময়ে অতি নগণ্য কারণে যুদ্ধ-ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তো। একটি মুরগির বাচ্চার জন্য এরাই তো একসময় চল্লিশ বছর যাবত যুদ্ধ করেছিলো। একটি কূপ, ছোট একটি বকরি কিংবা অন্য কোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরাই তো রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো। অথচ এরাই যখন রাসূল (সা.)-এর সংস্পর্শে এলো, বিপ্লব ঘটলো তাঁদের জীবনে। পার্থিব সকল দাবী-কামনা তাদের সামনে তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। এমনকি নিজের ঘর-বাড়ি মক্কার মুশরিকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে শুধু সামান্য পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে মদীনায় হিজরত তো অবশেষে এরাই করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

মদীনার আনসারী সাহাবীগণ এদেরকে 'তোমরা আমাদের ভাই' বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, আমাদের অর্ধেক সম্পদ আপনারা নিয়ে নিন। অবশিষ্ট অর্ধেক আমাদের জন্য রেখে দিন। কিন্তু মুহাজিরগণ উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের এসব অর্থ-সম্পদের প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ

নেই। তবে আমরা আপনাদের জমিতে শ্রম দিতে রাজি আছি। বিনিময়ে যে ফসল উৎপাদিত হবে, তা আমরা পরস্পরে বন্টন করে নেবো। এবার বলুন, এদের মাঝে যে পার্থিব লোভ-লালসা থৈ থৈ করতো, তা আজ কোথায় হারিয়ে গেলো?

উত্তপ্ত জিহাদের ময়দান। ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। ঠিক এ মুহূর্তে হাদীস শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করবেন। এ হাদীস শোনামাত্র এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে তুমি সত্যিই কি এমন কথা শুনেছ? বললেন, হ্যাঁ। আমি নিজ কানে শুনেছি এবং আমার হৃদয় তা পুরোপুরি সংরক্ষণ করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই সাহাবী বলে উঠলেন, ব্যস! তাহলে তো এ মুহূর্তে জিহাদ ছেড়ে দেয়া আমার জন্য হারাম। এ কথা বলেই তরবারি হাতে তুলে নিলেন। ঢুকে পড়লেন শত্রু-বাহিনীর ভেতর। তীর এসে বুকে বিদ্ধ হলো, বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল। রক্তমাখা বুকটা নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন–

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বার রবের কসম! আজ আমি সফল। চলে এসেছি আপন মনজিলে মকসুদে।

অথচ এরাই তো এক সময় দুনিয়ার মোহে দৌড়াতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংস্পর্শে তাদের জীবনচিন্তায় ঘটলো সোনালী বিপ্লব।

যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান

কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তিনি ফেরাউনকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছেন। মু'জিযা দেখিয়েছেন। মাটির উপর ছড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ছড়ি সাপ হয়ে গিয়েছে। ফেরাউন মনে করেছিল এটা যাদু। সে রাজ্যের সব যাদুকরকে সমবেত করে মূসার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলো। যাদুকরদেরকে বললো, আজ তোমাদের পরীক্ষার দিন। তোমাদেরকে তোমাদের বিদ্যার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মূসা একজন বড় যাদুকর। তার বিরুদ্ধে তোমরা জয়ী হতে হবে। তারা সকলেই ছিলো ফেরাউনের রাজ্যের নির্বাচিত যাদুকর। তাই তারা নিজেদের প্রাপ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। কুরআন মজীদের ভাষায়–

قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ (سورة الشعراء ٤١)

তারা ফেরাউনকে বললো, যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে আমরা পুরস্কার পাবো তো?

উত্তরে ফেরাউন বলেছিলো–

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (سورة الشعراء ٤٢)

হ্যাঁ, তোমরা আমার একান্ত নিকটজনও হবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে তারা তাদের হাতের দড়িগুলো ছেড়ে দিলো, কেউ ছেড়ে দিলো হাতের লাঠি। সেগুলো সাপ হয়ে এদিক- সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা অহিযোগে মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন, এবার তুমি তোমার লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দাও। হযরত মূসা নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে লাঠিটি অজগরের রূপ নিলো এবং যাদুকরদের সব সাপ গিলে ফেললো। যাদুকররা নিজেদের বিদ্যার ব্যাপারে খুব গর্বিত ছিলো। মূসা (আ.)-এর অজগর যখন তাদের যাদুর সাপগুলো খেয়ে ফেললো, তখন তারা বুঝতে পারলো, এটা যাদু নয়। যদি যাদু হতো, আমারই জয়ী হতাম। মূসা যা করছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই করেছেন। বাস্তবেই তিনি আল্লাহর নবী। তাদের অন্তরে একথা উদিত হতেই তারা মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনল। তারা মূসা (আ.)-এর মুজিযা স্বচক্ষে দেখেছিলো। মূসা (আ.)-এর সামান্য সংস্পর্শ পেলো। আর এ সামান্য সংস্পর্শে তাদের জীবনে এমন বিপ্লব ঘটলো যে, সকলেই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো–

آمَنَّا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى (سورة طه : ٧٠)

আমরা ঈমান আনলাম হারুন ও মূসার রবের প্রতি।

এ দৃশ্য দেখে ফেরাউন বলে উঠলো–

آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ

আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান এনে ফেললে?

সে যাদুকরদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলো। তাই যাদুকরদেরকে এই বলে শাসালো–

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقٰى (سورة طه : ٧١)

আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াবো। তখন তোমরা নিশ্চিতরূপে টের পাবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী। -(সূরা ত্বোয়া-হা : ৭১)

ফেরাউন যাদুকরদেরকে শাসাচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন, এ যাদুকররাই একটু আগে ফেরাউনের সঙ্গে নিজেদের যাদুর বিনিময় নিয়ে দরদাম করেছে। জানতে চেয়েছে যাদুর যুদ্ধে বিজয়ী হলে আমরা কী পাবো? আর এখন তাদের সামনে সেই লোভ-লাভের স্বপ্ন তো নেই-ই, উপরন্তু তাদের সামনে ঝুলছে ফাঁসির কাষ্ঠ। বরং তারা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ফেরাউনের ধমকের জবাব দিলো-

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (سورة طه : ٧٢)

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে প্রমাণ এসেছে, তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবোনা। কাজেই তুমি যা ইচ্ছা তা কর। (সূরা ত্বোয়া-হা : ৭২)

যাদুকরদের স্পষ্ট বক্তব্য, তুমি আমাদের মারতে পার, কাটতে পার, ফাঁসিতে ঝোলাতে পার- যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পার। এতে আমাদের টনক নড়বে না। এসবই তো দুনিয়ার ফয়সালা। আর আমাদের সামনে রয়েছে আখেরাতের দৃশ্য। চিরস্থায়ী জীবনের দৃশ্য। সে দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তোমার ধমককে আমরা পরওয়া করি না।

দেখুন, এক মুহূর্ত পূর্বেও যারা ছিলো দুনিয়াপূঁজারী, যারা একটু পূর্বেও নিজেদের যাদুর পারিশ্রমিক নিয়ে ফেরাউনের সঙ্গে দর কষাকষি করেছিলো, তারাই এখন ফাঁসিতে ঝুলতে প্রস্তুত। এ পরিবর্তন কীভাবে এলো?

মূলত এর কারণ হলো ঈমান ও সংস্পর্শের সম্মিলন। এর মাধ্যমেই তাদের জীবনের পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

সংস্পর্শের ফায়দা

মূলকথা হলো, ঈমান ও বিশ্বাসের সঙ্গে যখন সংস্পর্শ মিলিত হয়, তখনই অন্তরের মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি হয়। পার্থিব লোভ-লালসা তখন অন্তর থেকে মিটে যায়। সেখানে প্রবল হয়ে উঠে আখেরাতের চিন্তা। আখেরাতের ভাবনাই মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ করে তোলে। যদি কারও অন্তরে আখেরাতের

ভাবনা তিরোহিত থাকে, তাহলে প্রকৃত অর্থে সে মানুষ নয়। সে হিংস্রপ্রাণী। সে তখন সবসময় কামনা করে পার্থিব লোভ-লাভ। এ কামনা চরিতার্থ করতে কারো গলায় ছুরি চালাতে, কাউকে লাশ বানাতে তার একটুও দ্বিধা হয় না। তার কামনাজুড়ে থাকে একটাই ভাবনা– যে করেই হোক এ দুনিয়াটা আমার চাই। মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে হলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাকে ভাবতেই হবে। আর এটা অর্জিত হয় আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমেই। বুযুর্গানে-দ্বীনের সংস্পর্শই একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর করুণ অবস্থা

চারিদিকে শুধু সমস্যা আর সমস্যা। বইছে সমস্যার ঝড়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য খোলা হয় নানারকম অফিস। কায়েম করা হয়েছে আদালত। বসানো হয়েছে পুলিশ। কিন্তু সরকারী অফিসগুলোতেই চলে ঘুষের বাণিজ্য। বলুন, এর কী কোনো চিকিৎসা আছে। এর চিকিৎসার জন্য নতুন আদালত বসানো হয়েছে– দুর্নীতি দমন আদালত। এখন সে আদালতেও ঘুষ লাগে। আগে যেখানে পাঁচ টাকা ঘুষ হলে চলতো, এখন সেখানে গুণতে হচ্ছে দশ টাকা। ঘুষের এক অংশ পাচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা, আরেক অংশ নিচ্ছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। তারপর এ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে উপদেষ্টামণ্ডলী। এখন এসব উপদেষ্টার জন্যও দরকার হয় ঘুষের অর্থ। এভাবে ক্রমশ ঘুষের ফিরিস্তি কেবল দীর্ঘ হচ্ছে। কারণ, ঘুষ প্রতিরোধের জন্য যাকে বসানো হয়, তার মাথাতেই থাকে ঘুষের ফন্দি-ফিকির। কী করে আমার বাড়িটা অন্যের বাড়ির চেয়ে চমৎকার হবে। অন্যের গাড়ির চেয়ে আমার গাড়ি কি করে বেশি দামী হবে? কী করে আমার পোশাকটা অপরেরটার চাইতে বেশি জমকালো হবে? ফলে অফিস-আদালত যতই বাড়ছে, যতই নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে, ততই ঘুষের প্রতাপ বাড়ছে। আইন বিক্রি হচ্ছে এক-দুই টাকায়। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা দাবী করতে পারি যে, যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, যদি আখেরাতের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যদি আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি না থাকে, তাহলে এই আইন, এই অফিস-আদালত, এই পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। সবই অনর্থক।

আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র। যেখানকার প্রতিজন মানুষ শিক্ষিত। একশতে একশজনই শিক্ষিত। অর্থ-প্রাচুর্য রীতিমত সেখানে থৈ থৈ করছে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি ঝুমঝুম করছে। পুলিশ সর্বদা সজাগ ও সতর্ক।

পুলিশ ঘুষ খায় না। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দাবানো যায় না। সংবাদ পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌঁছে সরেজমিনে, ঘটনাস্থলে। কিন্তু এমন সভ্যদের অবস্থা হলো এই– সেখানকার সভ্যদের কাছে আমাকে এ উপদেশ শুনতে হয়েছে, দয়া করে আপনি হাতঘড়ি হাতে দিয়ে বাইরে যাবেন না। ভালো হবে যদি পকেটে কোনো টাকা-পয়সা না রাখেন। একান্ত প্রয়োজনে সামান্য রাখতে পারেন। কারণ, যে কোনো মুহূর্তে আপনার ঘড়ি কিংবা টাকা-পয়সা ছিনতাই হতে পারে। এ তুচ্ছ বস্তুর জন্য ছিনতাইকারীরা আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এটা কাল্পনিক কোনো গল্প বলছি না। তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশ আমেরিকার কথাই বলছি। এসবই সেখানে অহরহ ঘটছে। আর সেখানে আইন ও আইনবিদরা বসে-বসে তামাশা দেখছে। তিন মিনিটের গতিসীমাসম্পন্ন পুলিশ-বাহিনী তো সেখানে অসহায়। অফিস-আদালত সবই আপন স্থানে আছে। একদিকে চাঁদের পেটে পতাকা উড়াচ্ছে আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছে– আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অপরাধ কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ড. ইকবাল চমৎকারভাবে বলেছিলেন–

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথের অন্বেষণকারীরা
নিজেদের চিন্তার জগতে ভ্রমণ করতে পারেনি।
সূর্যের রশ্মি যারা আবদ্ধ করলো,
জীবনের ঘন অন্ধকার নিশীকে
প্রভাতের আলোকে তারা উদ্ভাসিত করতে পারেনি।

পৃথিবী আজ এ দৃশ্য দেখছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পায়ের কাছে মাথা নত না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দিক-নির্দেশনার আলোকে নিজেদের অন্তপ্রাণকে আখেরাতের আলো দ্বারা আলোকিত করে না তুলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী এ করুণ দৃশ্যকেই মেনে নিতে হবে। হাজার আইন তৈরি কর। অফিস-আদালত যত খুশি বসাও। তোমাদের সমস্যার

কোনো কুল-কিনারা হবে না। আইন ও অফিস-আদালত মুক্তি দিতে পারবে না। মুক্তির পথ একটাই– বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ গ্রহণ। তাদের সংস্পর্শে থেকে, তাদের কথামত চলে নিজেদের অন্তরকে আখেরাতের ফিকির দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারলেই শুধু এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পার। অন্যথায় নয়।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অপরকে খুশি করুন

"ঝগড়া-বিবাদ নেই, হিংসা-ফ্যাসাদ নেই এমন স্বপ্নের দুনিয়া তো জান্নাততুল্য। একটু ভেবে দেখুন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যদি অপরকে খুশি করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে দুনিয়াতে কি এমন চিত্র ফুটে উঠবে না? তাই বিষয়টির প্রতি সযত্ন হোন। অপরকে খুশি করুন। প্রয়োজনে নিজে একটু কষ্ট করুন।"

অপরকে খুশি করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ سُرُوْرٌ يُدْخِلُهُ عَلٰى مُسْلِمٍ (المعجم الكبير، حديث نمبر ١٣٦٤٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

প্রাককথন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় আমলসমূহ থেকে একটি পছন্দনীয় আমল হলো একজন মুমিন অপর মুমিনের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করাবে।

সনদ বিবেচনায় হাদীসটি দুর্বল। তবে আরো বহু হাদীস ও প্রমাণ দ্বারা হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন এবং নিজের বাণী ও কর্ম দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একজন মুমিনকে খুশি করা আল্লাহ তা'আলার একটি পছন্দনীয় আমল।

আমার বান্দাদেরকে খুশি রাখ

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসে, তখন যেন আল্লাহ বলেন, যদি তুমি আমাকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমাকে তো এ দুনিয়াতে তুমি কাছে পাবে না, তবে হ্যাঁ, আমার বান্দাদেরকে পাবে, পাবে আমার সৃষ্টিকূলকে। সুতরাং তুমি তাদেরকে ভালোবাস। আর এ ভালোবাসার দাবী হলো তুমি তাদেরকে সন্তুষ্ট কর।

আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে দুধরনের রীতি পাওয়া যায়। উদারনীতি ও সংকীর্ণনীতি। অথচ সঠিক নীতি হলো মধ্যপন্থার নীতি। অনেকে অপর মুসলমানকে খুশি করার বিষয়টি মোটেও গুরুত্ব দেয় না। তারা জানে না, এটি কত মহান ইবাদত। একজন মুসলমানকে খুশি করলে আল্লাহ তাকে শুভ পরিণাম দেন– এ ব্যাপারটির অনুভূতিও তাদের অন্তরে নেই। বুযুর্গানে-দ্বীন বলেছেন–

دل بدست آور کہ حج اکبر است

অর্থাৎ– কোনো মুসলমানের অন্তর জয় করে নেয়া হজ্জে আকবার সমতুল্য। কথাটি নিছক কথার কথা নয়। বাস্তবে মুসলমানকে খুশি করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় আমল।

অপরকে খুশি করার ফল

ঝগড়া-বিবাদ নেই, হিংসা-ফ্যাসাদ নেই এমন স্বপ্নের দুনিয়া তো জান্নাততুল্য। একটু ভেবে দেখুন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যদি অপরকে খুশি করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে দুনিয়াতে কি এ চিত্রই ফুটে উঠবে না? তাই বিষয়টির প্রতি যত্নবান হোন, খুব গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে নিজে একটু কষ্ট করুন। এক-দুমিনিটের কষ্ট সয়ে নিতে পারলে এবং এতে অপর মুসলমান খুশি হলে আল্লাহ তা'আলা পরকালে অনেক সাওয়াব দান করবেন।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করা একটি সদকা

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ধরনের সদকার কথা বলেছেন। বলেছেন এই আমল সদকা, ওই আমল সদকা এবং সেই আমলও সদকা। অর্থাৎ– এসব আমলে ঠিক সদকার মত সাওয়াব পাওয়া যাবে। তারপর এ হাদীসের একটি অংশে তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَاَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

অর্থাৎ– নিজের মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমাখা চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করাও একটি সদকা। যখন তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হবে তখন হাসিহাসি ভাব নিয়ে মিলিত হবে। যেন সে বুঝে নেয় যে, তোমাদের এ পারস্পরিক সাক্ষাতে তুমি অসন্তুষ্ট নও; বরং খুশি।

সুতরাং যেসব লোক সাক্ষাতের জন্য নিয়ম ও সময় বেঁধে দিয়ে রেখেছে এবং যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আভিজাত্যের পর্দা ভেদ করতে হয়, তারা সুন্নাতের উপর আমল করছে না।

গুনাহ দ্বারা অপরকে খুশি করা যাবে না

অপরদিকে অনেকে এক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত উদারনীতি অবলম্বন করে আছে। তারা বলে, যেহেতু মুসলিম ভাইকে খুশি করা ইবাদত, তাই আমরা এ ইবাদত করি। চাই গুনাহের মাধ্যমে হলেও আমরা অপরকে খুশি রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ বলেছেন, অপরকে খুশি রাখতে। তাই হোক না গুনাহ তবুও তো খুশি রাখার ইবাদতটুকু করছি। মনে রাখবেন, এটাও একপ্রকার ভ্রষ্টতা। কারণ, অপরকে খুশি করার মর্মই তারা বোঝেনি। এর মর্মার্থ হলো, অপরকে খুশি রাখতে হবে জায়েয ও বৈধতার সীমা থেকে। এখন এ ক্ষেত্রে অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নেয়ার অর্থ হলো, সে বান্দাকে খুশি করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলো। এর নাম তো ইবাদত নয়। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবকে খুশি করতে গিয়ে গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার নাম ইবাদত নয়।

কবি ফয়জীর ঘটনা

তখন সুলতান আকবরের যুগ। কবি ফয়জী নামে এক বিখ্যাত কবি ছিলো। একবার সে নাপিতের দোকানে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলো। ইত্যবসরে এক ভদ্রলোক তাকে দেখে বললেন–

آقا : ریش می تراشی ؟

জনাব ফয়জী! আপনি দাড়ি কামাচ্ছেন?

কবি ফয়জী উত্তর দিলো–

"بلے، ریش می تراشم - دل کسے نمی خراشم"

হ্যাঁ, দাড়ি কামাচ্ছি বটে; কিন্তু কারো অন্তর তো ভাঙছি না।

অর্থাৎ কবি ফয়জী বোঝাতে চেয়েছে, আমার আমল আমার সঙ্গে। আর আমি তো কারো মনে কষ্ট দিচ্ছি না। কিন্তু আপনি যে আমাকে খোঁচা দিলেন, এতে তো আমার মনে ব্যথা পেয়েছি। তখন ঐ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন–

"دلے کسے نمی خراشی، دلے دلے رسول اللہ می خراشی (صلی اللہ علیہ وسلم)"

জনাব ফয়জী! আপনি বলছেন, আপনি কারো মনে ব্যথা দেননি। কিন্তু আমি বলি, আপনার এ আমলের মাধ্যমে তো আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মনে ব্যথা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ওয়ালারা অন্যকে খুশি রাখে

সুতরাং আমাদের সমাজের কিছু লোক যে যুক্তি দিয়ে বলে, অপরকে খুশি করা ইবাদত, তাই আমি অপরকে খুশি করছি। হোক না তা গুনাহের মাধ্যমেই, তাদের এ জাতীয় আচরণ মূলত আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা কোনো ইবাদত নয়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন–

"یہ معمول صوفیاء کرام کا مثل طبعی کے ہے"

অর্থাৎ– সুফিগণ মুসলমানকে খুশি রাখতেন। এটা ছিলো তাঁদের স্বভাবজাত। তাদের কাছে যে-ই আসতো, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতো। তারপর থানবী (রহ.) বলেন–

"اس کی ایک شرط ہے ، وہ یہ کہ اس سرور کو داخل کرنے سے خود شرور میں داخل نہ ہو جائے"

অর্থাৎ– অপরকে খুশি করার ক্ষেত্রে একটি শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তাহলো, এটি করতে গিয়ে নিজে গুনাহে লিপ্ত হওয়া চলবে না। তারপর তিনি আরো বলেন–

"جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب "صلح کل" رکھا ہوا ہے"

অর্থাৎ– যেমন অনেকেই এক্ষেত্রে নিজেদেরকে 'কম্প্রোমাইজ গ্রুপ' বলে। তাদের কথা হলো, যে যাই করুক এতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। আমরা কারো দোষ ধরবো না। কোনো মন্দকে মন্দ বলবো না। আমরা কম্প্রোমাইজে বিশ্বাসী। তাদের এ মানসিকতা ভ্রান্ত। তিনি আরো বলেন–

"بعض لوگ تو اسی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے"

অর্থাৎ– অনেকে তো এ কারণেই সৎ কাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে কাউকে বাঁধা দেয় না। তারা ভাবে, অমুককে নামায পড়তে বললে তার মনে কষ্ট যাবে। অমুকের অমুক গুনাহটি ধরলে সে মনে ব্যথা পাবে। আর আমরা কাউকে মনে কষ্ট দিতে চাই না। অবশেষে তিনি বলেন–

"کیاان کوقران پاک کا یہ حکم نظر نہیں آیا کہ : "وَلاَ تَأخُذُکُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِیْ دِیْنِ اللهِ " کہ تم کو اللہ کے دین کے بارے میں ان پر ترس نہ آئے"

অর্থাৎ– এ জাতীয় মনোভাব যারা পোষণ করে, তারা কি কুরআন মজীদের এ আয়াত দেখে না। যেখানে বলা হয়েছে যে, দ্বীন পরিপন্থী কাজে কাউকে লিপ্ত দেখলে তাকে তা থেকে বারণ করবে। এক্ষেত্রে তোমার মাঝে তার উপর করুণা আনা যাবে না।

নম্রভাবে অসৎকাজের নিষেধ করবে

অবশ্য অসৎ কাজে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে ব্যথা পেলেও যেন তা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। অত্যন্ত নম্র ভাষায় দরদ, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতা মিশিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। গোস্বা দেখানো যাবে না। এতে কিছুটা হলেও তার মনোঃকষ্ট কমে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অপরের মর্জি ও রুচির মূল্যায়ন করুন

"লাভালাভঘেরা এ দুনিয়াতে সব কাজ নিজের মর্জিমতো হয় না। এজন্য হোক না নিজের কষ্ট, তবুও যেন অন্য কেউ কষ্ট না পায়। নিজের কষ্ট মেনে নেয়া যায়, কিন্তু অপরের কষ্ট কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষা-ই দিয়েছে। এটাই ইসলামের শিষ্টাচার পর্বের সারকথা।"

"হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) নিজের খানকায় বসে ইসলামের এসব শিষ্টাচার লোকদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। বুযুর্গদের 'সোহবত' ছাড়া এসব শিক্ষা সচরাচর পাওয়া যায় না। এটাই আমার অভিজ্ঞতা।"

অপরের মর্জি ও রুচির মূল্যায়ন করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ ذَرِّالْغِفَارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَالِقُوْا النَّاسَ بِاَخْلاَقِهِمْ - اَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اتحاف السادة المتقين ، ٦/٣٥٤)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করবে তার স্বভাব-চরিত্র ও রুচি অনুযায়ী। অপরের রুচি ও মেজাজের মূল্যায়ন করাও দ্বীনেরই অংশ। এমন কাজ করা যাবে না যে, যার কারণে অপরের মনে কষ্ট যায়। ক্ষেত্রবিশেষে কাজটি হারাম নয়; বরং বৈধ, তবুও করবে না। এটাও ইসলামের শিষ্টাচার। আল্লাহ তা'আলা হযরত থানবী (রহ.)-এর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। তিনি ইসলামের এ অধ্যায়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর রুচির মূল্যায়ন

হাদীস শরীফে এসেছে, একবারের ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) অবস্থান করছিলেন নিজেরই বাসগৃহে। পরিধানে ছিল সেলাইবিহীন লুঙ্গি। লুঙ্গিটা তিনি বেশ উঁচু করে পরেছিলেন। সম্ভবত ঘটনাটি তখনকার, যখন হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি লুঙ্গি যদিও উঁচু করে পরেছিলেন, তবে এতটুকু উঁচু করে পরেননি যে, হাঁটুর উপর চলে গিয়েছিলো। ইত্যবসরে দরজা নক করার শব্দ হলো। জানা গেলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এসেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে বসলেন। আর রাসূলুল্লাহ যেভাবে বসা ছিলেন, সেভাবেই বসে রইলেন। পবিত্র পা তাঁর আগের মতই উন্মোচিত থাকলো। কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। জানা গেলো, এবার এসেছেন হযরত উমর (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনিও রাসূলের পাশেই বসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবারও নড়লেন না। পূর্বের মতই পা খোলা রাখলেন। আরো কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব এলো, আমি উসমান। রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গে-সঙ্গে লুঙ্গিটা নামিয়ে নিলেন এবং নিজের পবিত্র পা ভালোভাবে ঢেকে দিলেন। তারপর উসমান (রা.)কে অনুমতি দিলেন ভেতরে আসার। তিনিও ভেতরে প্রবেশ করে বসে পড়লেন।

ফেরেশতারা যাঁকে লজ্জা পেতো

এ সাহাবী উক্ত দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু বকরের আগমনে এবং এরপর উমরের আগমনে আপনি নড়লেন না, লুঙ্গিও নামালেন না; কিন্তু যখনই উসমান এল, তখন লুঙ্গি নামিয়ে দিলেন। আপনার পবিত্র পা ঢেকে দিলেন। এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জিত হন, আমি কেন তাকে লজ্জা পাবো না? লজ্জা ছিলো পরিপূর্ণ লজ্জাশীল ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন হযরত উসমান (রা.) এর বিশেষ গুণ। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিলো– كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالاِيْمَانِ অর্থাৎ– পরিপূর্ণ লজ্জাশীল ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সকল সাহাবীর রুচি ও স্বভাব সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতেন যে, তিনি একজন লজ্জাশীল পুরুষ। হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের সতর। তাই এর আগ পর্যন্ত খোলা রাখা নাজায়েয নয়। এ জন্যই তিনি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর আগমনের পরেও পবিত্র পা খোলা রেখেছিলেন, কিন্তু উসমান (রা.)-এর বেলায় তিনি ভাবলেন, উসমান যেহেতু স্বভাবগতভাবেই লাজুক, তাই তার সামনেও যদি পা খুলে রাখি, তাহলে এটা তার সাধারণ স্বভাববিরোধী হবে, হয়ত সে লজ্জা পাবে। এ কারণে তাঁর আগমনের পূর্বে তিনি পা ঢেকে নিলেন এবং লুঙ্গি নীচু করে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামান্য ইঙ্গিতে যাঁরা নিজেদেরকে কুরবান করে দেয়ার জন্য প্রতিটি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতেন, তারাই তো সাহাবায়ে কেরাম। এরপরেও আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁদের রুচি ও স্বভাবের প্রতি সম্মান দেখাতেন। মনে করুন, উসমান (রা.)-এর আগমনের কারণে তিনি যদি লুঙ্গি না উঠাতেন, তাহলে উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে কি কোনো অভিযোগ উঠতো? মোটেও নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে শিক্ষা দিলেন যে, যার স্বভাব যেমন তার সঙ্গে ব্যবহার কর তেমন। লোক বুঝে কথা বল, পাত্র বুঝে বস্তু রাখ।

উমর (রা.)-এর স্বভাবের মূল্যায়ন

হযরত উমর (রা.) একবার এলেন রাসূলুল্লাহ-এর দরবারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, উমর, আমি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে জান্নাত দেখলাম। সেখানে একটি সুবিশাল অট্টালিকাও দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার? বলা হলো, এটা উমরের। অট্টালিকাটি আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে। মন চেয়েছে যে, একটু প্রবেশ করি এবং ঘুরে-ঘুরে দেখি। কিন্তু উমর, তখনই তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা যা তোমাকে বেশি দান করেছেন। শোনো উমর! এজন্যই আমার মনে হলো, তোমার আগে তোমার ভবনে প্রবেশ করা তোমার আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিশীল হবে। তাই তোমার ভবনটাতে ঢুকলাম না। হযরত উমর (রা.) এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। বললেন, ! أَوَعَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ– ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বেলায়ও কি আমার এ আত্মমর্যাদাবোধ! তা যদি থেকে থাকে, তবে আপনার বেলায় তো নয়। তা তো অন্যদের বেলায়।

প্রত্যেক সাহাবীর মেযাজের মূল্যায়ন

এখান থেকে একটু ভাবুন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কতটা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের রুচি ও মেযাজের প্রতি। একথা ভাবেন নি যে, আমি শিক্ষক; সে আমার ছাত্র। আমি পীর; সে আমার মুরিদ। সুতরাং অধিকার সবই আমার; তাঁর কোনো অধিকার নেই। বরং তিনি প্রতিজন সাহাবীর রুচির মর্যাদা দিয়েছেন এবং আমাদেরকেও অপরের রুচিবোধের মূল্যায়ন করার শিক্ষা দিয়েছেন।

উম্মুহাতুল মুমিনীন ও আয়েশা (রা.)-এর রুচির মূল্যায়ন

একবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন। হযরত আয়েশা (রা.)ও তখন তাঁর সঙ্গে ইতেকাফ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এমনিতে মহিলাদের ইতেকাফ মসজিদে নয়; বরং ঘরেই করা উচিত। কিন্তু আয়েশা (রা.) এর ব্যাপারটি ছিলো ভিন্ন। কেননা, আয়েশা (রা.)-এর ঘরের দরজা মসজিদের দিকে খোলা ছিলো। সুতরাং তাঁর ইতেকাফের স্থান দরজার সামনে করা হলে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরও ইতেকাফের স্থান সেখানে করা হলে পর্দা লংঘনের আশংকা থাকতো না। সেজন্য তাঁর ইতেকাফের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তাই তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমতি দিয়ে দিলেন। এদিকে রামাযানের বিশ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, দেখতে পেলেন মসজিদে নববীতে অনেকগুলো তাঁবু। সাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, এসব তাঁবু উম্মাহাতুল মুমিনীনের। আয়েশা (রা.)-এর অনুমতি প্রাপ্তিকে অন্যান্য স্ত্রীগণও সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ মনে করে তাঁরাও মসজিদে তাঁবু করে নিলেন। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুভব করলেন, আয়েশা (রা.)-এর ব্যাপার আর অন্যান্য স্ত্রীর ব্যাপার এক নয়। কারণ, আয়েশা (রা.) প্রয়োজনে পর্দা লংঘন ছাড়াই ঘরে যেতে পারবেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের আবাসস্থল মসজিদ থেকে দূরে হওয়ার কারণে বারবার আসা-যাওয়ার কারণে পর্দা লংঘনের আশংকা রয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের মসজিদে ইতেকাফ করা উচিতও নয়। তাই তাঁদের তাঁবু দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

آلْبِرَّ يُرِدْنَ

এরা কী এভাবে সাওয়াব উপার্জন করতে চাচ্ছে? অর্থাৎ মহিলাদের এভাবে ইতেকাফ করার মাঝে কোনো সাওয়াব নেই।

এ বছর আমিও ইতেকাফ করবো না

কিন্তু বিষয়টি জটিল হয়ে গেলো। কেননা, আয়েশা (রা.)কে ইতেকাফের অনুমতি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই দিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাবলেন, আয়েশা (রা.)-এর তাঁবু ঠিক রেখে অন্যান্য স্ত্রীর তাঁবু সরানোর আদেশ যদি দেয়া হয়, এতে অন্যান্যরা মনে কষ্ট পাবে। তারা ভাববে, আয়েশাকে অনুমতি দেয়া হলো, অথচ আমাদেরকে দেয়া হলো না। আর যদি আয়েশাসহ সকলের তাবু সরানোর নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে হযরত আয়েশা মনে ব্যথা পাবেন। কেননা, ইতোপূর্বে তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলের মেযাজ ও মনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘোষণা করলেন, আমি এ বছর ইতেকাফ করবো না। এ ঘোষণা শুনে সকলেই নিজ নিজ তাঁবু উঠিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আর ওই বছর ইতেকাফ করেননি।

ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ

প্রতিবছর রামাযানের এ দিনগুলোতে ইতেকাফ করা ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি নিয়মতান্ত্রিক আমল। কিন্তু আয়েশা (রা.) সহ অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের মেযাজ ও মনের প্রতি তাকিয়ে এ নিয়মতান্ত্রিক আমলটি তিনি ছেড়ে দিলেন। সারা জীবনে এই একবারই তিনি ইতেকাফ করেননি। পরবর্তী রামাযানে এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি দশ দিনের স্থলে ইতেকাফ করেছেন বিশ দিন।

এটাও সুন্নাত

দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছোটদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করলেন। ইতেকাফের মত স্পষ্ট আমলও এমনভাবে আদায় করেছেন যে, যেন অপরের মনে কষ্ট না যায়। আমলও করলেন, অপরের মনে কষ্টও দিলেন না। এতে আমাদের জন্য এ শিক্ষাও রয়েছে যে, যে আমলটি ফরয, ওয়াজিব পর্যায়ের নয়; বরং মুস্তাহাব ওই আমলটির কারণে যদি কারও মনে কষ্ট যায়, তাহলে প্রয়োজনে তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে বা পিছিয়ে দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত।

ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর আমল

রামাযানে আসরের নামায মসজিদে পড়ার পর ইতেকাফের নিয়তে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা ছিলো ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর নিয়মিত আমল। এ সময়টাতে তিনি কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ, মুনাজাত ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। এটা চলতো ইফতার পর্যন্ত। তিনি নিজের মুরিদদেরকেও আমলটি করার পরামর্শ দিতেন। কারণ, এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো মসজিদে কাটানো সম্ভব হয়, ইতেকাফের ফযীলত লাভ করা যায়, আমল আদায় করা যায় এবং সবশেষে দু'আ ও মুনাজাত করার ও তাওফীক হয়ে যায়। রমাযানের সারনির্যাস তো আল্লাহর কাছে অধিক দু'আ করা। কেননা, ইফতারের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মানবহৃদয় আল্লাহর প্রেমে উতলা হয়ে উঠে, তাই যে দু'আই করা হয় কবুল হয়। এজন্যই তিনি মুরিদদেরকে এটা করার পরামর্শ দিতেন, তাগিদও দিতেন। আলহামদুলিল্লাহ হযরতের মুরিদদের মাঝে এ আমলের গুরুত্ব এখনও আছে।

মসজিদে নয়; বরং ঘরে থাক

একবারের ঘটনা, হযরতের এক মুরিদ হযরতকে বললেন, হযরত, আপনার কথামতো আমি রামাযানে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইতেকাফের নিয়তে মসজিদেই যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দু'আ-মুনাজাতে কাটাই। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললো, সারাদিন তো বাইরেই থাকেন, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু ঘরেই থাকুন, তাহলে একসঙ্গে ইফতার করে কিছু আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম। আপনি তো এ সময়টুকুও মসজিদে কাটাচ্ছেন, এতে একত্রে বসে কথাবার্তা বলা ও ইফতার করার সুযোগ হয় না। এজন্য হযরত আমি এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, এ সময়টুকুতে কী করবো? স্ত্রীর ইচ্ছামতো ঘরে থাকবো, না মসজিদে কাটাবো? হযরত কথাগুলো শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ সময়টুকু মসজিদে না কাটিয়ে আপনার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঘরেই কাটান। ঘরে থেকেই যতটুকু সম্ভব যিকির-আযকার, তেলাওয়াত ইত্যাদি করুন এবং একসঙ্গে ইফতার করুন।

তুমি পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে

তারপর হযরত বললেন, আমি যে তোমাকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে কাটানোর জন্য বলেছি– এটা মুসতাহাব আমল। আর তোমার স্ত্রী যা বলেছে– এটা তার অধিকার। স্বামীর কর্তব্য হলো, শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে

থেকে স্ত্রীর মন রক্ষা করে চলা, যা কখনও-কখনও ওয়াজিবও হয়ে যায়। সুতরাং যদি তুমি স্ত্রীর এ বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে মসজিদের ইবাদত ছেড়ে দাও, আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ওই ইবাদতের বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছা পূরণ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ। ইনশাআল্লাহ' এতে তুমি মসজিদে ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

এখন যিকির নয়; বরং রোগীর সেবা কর

একবার হযরত বললেন, এক ব্যক্তির ঘটনা। সে তার অযিফা ইত্যাদি আদায় করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিল। প্রতিদিন ওই সময় একাকি যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ বিভিন্ন ইবাদত আদায় করতো। হঠাৎ তার বাসার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন সে রোগীর দেখাশোনা ইত্যাদিতে সময় কাটাতে লাগলো। ফলে যিকির-আযকার, অযিফা ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিলো না। এর কারণে তার অন্তরে একটা অব্যক্ত ব্যথা খচখচ করতো। ভাবতো, হায়! রোগীর দেখাশোনা করতে গিয়ে আমার অযিফা আদায় হচ্ছে না।

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত বলেন, এক্ষেত্রে ব্যথিত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, এ সময়ে রোগীর দেখা-শোনাই ইবাদত। এটা তার যিকির-আযকার, অযিফা ইত্যাদি থেকেও উত্তম ইবাদত। আর ক্ষেত্রবিশেষ তো রোগীকে দেখা-শোনা করা ফরযও হয়ে যায়।

সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখ

মূলত সময়ের দাবীমতো কাজ করার নামই তো দ্বীন। লক্ষ্য রাখতে হবে, এসময় তোমার কাছে দ্বীনের দাবী কি? যেমন উক্ত ব্যক্তির উপর দ্বীনের দাবী হলো, যিকির আপাতত ছেড়ে দাও, রোগীর সেবা কর। রোগীর সেবার সময় এটা ভাববে না যে, আমি তো যিকির-আযকার ইত্যাদির ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছি। কেননা, সে তো দ্বীনের দাবীমতোই আমল করেছে।

রামাযানের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে না

আরেকদিন হযরত বলেন, মনে কর, এক ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরাবস্থায় আছে, তাই রোযা রাখতে পারেনি। তার জন্য শরীয়তের বিধান হলো, পরবর্তী সময়ে রোযা ক্বাজা করা। এজন্য সে পরবর্তীতে ওই রোযাটি কাজা করে নিলো।

যেহেতু তার এ ওযরটি ছিলো শরীয়তের পক্ষ থেকে, সুতরাং যেদিন সে কাজা করবে, ওই দিন রামাযানের ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবেনা। কেননা, তার ওযর তো আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। এজন্যই তো তাকে অন্যদিন কাজা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলে আল্লাহ কি তাকে রামাযানের ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন? না, তা করবেন না। আল্লাহ তা'আলার রহমত সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করা উচিত হবে না।

অযথা পীড়াপীড়ি করবেন না

মোটকথা, সময়ের দাবী অনুপাতে কাজ করাই ইসলামের শিক্ষা। এ মুহূর্তে দ্বীন আমার কাছে কী চায়– তাই করতে হবে। নিজের মত ও ইচ্ছা চালিয়ে দেয়ার নাম দ্বীন নয়। অপরের সঙ্গে উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও আচার-ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখবে তার রুচি ও মানসিকতার প্রতি। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার রুচি ও মেযাজে যেন চাপ সৃষ্টি না হয়। সমাজ সংস্কারের জন্য এ বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী। মনে কর, কোনো একটি বিষয় একজনের রুচি ও ইচ্ছাবিরোধী। এখন তুমি যদি অযথা পীড়াপীড়ি করে ওই বিষয়টা আরেকজনের উপর চাপিয়ে দিতে চাও, তাহলে হতে পারে, সে তোমার কাছে নতি স্বীকার করে বিষয়টি মেনে নিবে। কিন্তু এটা তো তোমার চাপের কারণে মেনে নিবে। এতে অবশ্যই তার মনে কষ্ট যাবে। সুতরাং তাকে অযথা কষ্ট দিলে। এরজন্য তুমি গুনাহগার হয়ে যাবে।

সুপারিশ এভাবে করুন

বর্তমানে সুপারিশ করানোর প্রবণতা খুব বেশি। কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়া মানেই প্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে যেন সুপারিশ করা যায়। এক্ষেত্রে কুরআন মজীদের এ আয়াতটিও বেশ মনে রাখা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে। সুপারিশ করার ফযীলত অনেক। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ যে ভুলটি করে তাহলো, তারা একথা মনে রাখে না যে, সুপারিশ ফযীলতের কারণ অবশ্যই। কিন্তু সেটা তখন ফযীলতের কারণ হবে, যখন একথার প্রতি লক্ষ্য রেখে সুপারিশ করা হবে যে, যার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে সেটা যেন তার রুচি ও মেযাজবিরোধী না হয়। তুমি হয়ত কাউকে খুশি করার জন্য সুপারিশ করলে, কিন্তু হয়ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

কাছে তা পাহাড় মনে হবে। সে ভাববে, এত বড় ব্যক্তি আমার কাছে সুপারিশ করেছে। সুপারিশ গ্রহণ করলেও সমস্যা, না করলেও সমস্যা। গ্রহণ করতে হলে অনেক নিয়ম-নীতিকে পেছনে ঠেলে রাখতে হয়। আর না করলে ওই 'মহান-ব্যক্তির'র মনে কষ্ট যায়। মনে রাখবে, এরূপ ক্ষেত্রে তোমার এটা সুপারিশ নয়, বরং চাপ প্রয়োগ। এজন্যই বলি, সুপারিশ করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিলো কারো কাছে সুপারিশ করার সময় একথাগুলো অবশ্যই তিনি লিখতেন যে–

"اگر آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو تو آپ انکا یہ کام کر دیجئے"

অর্থাৎ– যদি আপনার কোনো সমস্যা না হয় এবং নিয়ম-নীতিবিরোধী না হয়, তবে তার এ কাজটি করে দিন।

কখনও-কখনও আরেকটু বাড়িয়ে এভাবে লিখতেন–

"اگر آپ کی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ یہ کام نہ کریں تو مجھے ادنی ناگواری نہیں"

অর্থাৎ– যদি আপনার সমস্যা হয় এবং কাজটি আপনি না করেন, তবে এতে আমার বিন্দুমাত্র মনোকষ্ট যাবে না।

কথাগুলো লিখতেন যেন তার মনে চাপ সৃষ্টি না হয়। মূলত এটাই হলো সুপারিশের সঠিক পদ্ধতি।

এক ভদ্রলোকের ঘটনা। তিনি আমার কাছে এসে সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, কী কাজ? বলতে লাগলেন, কাজের কথা পরে বলি, এর আগে আমার সঙ্গে ওয়াদা করুন যে, কাজটা করে দিবেন। বললাম, কাজের কথা না জেনে কিভাবে আপনার সঙ্গে ওয়াদা করবো যে, করে দেবো? বলতে লাগলেন, না, আগে ওয়াদা করুন যে, কাজটা করে দিবেন। বললাম, কাজটা যদি আমার সাধ্য বহির্ভূত হয়, তবে কিভাবে করবো? বলতে লাগলেন, কাজটা আপনার সাধ্যের ভেতরেই। বললাম, আগে বলুন না কাজটা কী? বলতে লাগলেন, আপনি করে দিবেন বলে ওয়াদা না করা ছাড়া আমি বলবো না। আমি তাকে বারবার বোঝালাম, প্রথমে কাজটা সম্পর্কে আমার সাধারণ ধারণা হোক, তারপর ওয়াদা করবো। নতুবা ওয়াদা করবো কিভাবে? এবার তিনি বলতে লাগলেন, আপনি যদি ওয়াদাই না করেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক।

এবার আপনারাই বিচার করুন, এটা সুপারিশ, না বলা চাপ প্রয়োগ? সুপারিশের এ পদ্ধতি কী সঠিক? অথচ বর্তমানে একজনের সঙ্গে অন্যজনের

ঘনিষ্ঠতা মানেই সম্ভব হোক বা না হোক সুপারিশ করা চাই। মূলত এটা তো ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং এটা তো সম্পূর্ণ ইসলামের শিষ্টাচার পরিপন্থী। আর অন্যায়ভাবে কাউকে এ ধরনের চাপে ফেলা গুনাহ।

সম্পর্কের দাবী পরিণত হয়েছে প্রথায়

বর্তমানে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা প্রথায় পরিণত হয়েছে। প্রথার গুরুত্বের উপরই বর্তমানের পারস্পরিক হৃদ্যতা নির্ভরশীল। যেমন- একজন কাউকে দাওয়াত দিলো, সঙ্গে-সঙ্গে তার পেছনে লেগে থাকলো যে, অবশ্যই দাওয়াত কবুল করতে হবে। এটা ভাবে না যে, লোকটি দাওয়াত খেতে হলে কতদূর থেকে আসতে হবে। কত কষ্ট পোহাতে হবে। দাওয়াতে অংশগ্রহণের মত অবস্থা তার আছে কি-না। এসব বিষয়ে মাথাব্যথা দাওয়াতদানকারীর নেই। তার কাজ তো শুধু দাওয়াত দেয়া।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর দাওয়াত

আমাদের বুযুর্গ হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী (রহ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ মাকাম দান করুন। এ বুযুর্গ ছিলেন হযরত মুফতী শফী (রহ.)-এর ঘনিষ্ট বাল্যবন্ধু। একবার তিনি লাহোর থেকে করাচিতে এলেন । আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দারুল উলূমে এলেন। এমন সময় এলেন, যখন খানার সময় ছিলো না। আব্বাজান তাঁর আগমনে দারুণ খুশি হলেন। শানদার তরিকায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। যখন তিনি বিদায় নিতে চাইলেন, আব্বাজান বললেন, ভাই মাওলানা ইদ্রীস, আমার মন চায়, একবেলা খানা আপনি আমাদের এখানে খেয়ে যান। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনি যাবেন অনেক দূরে, হাতেও সময় কম। একদিন পরেই চলে যাবেন লাহোরে। এ মুহূর্তে যদি আপনাকে পীড়াপীড়ি করি যে, এক বেলা খানা খেয়ে যান, আমি বুঝি, তবে এটা দাওয়াত নয়; বরং 'আদাওয়াত' (শত্রুতা) হবে। এতে আপনার কষ্ট হবে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আবার এছাড়া মনও যে মানে না। এজন্য আপনার খেদমতে সামান্য হাদিয়া পেশ করলাম। আপনার দাওয়াতে যে পরিমাণ খরচ করতাম, দয়া করে এ পরিমাণ হাদিয়াটুকু কবুল করুন। আমি খুশি হবো। মাওলানা ইদ্রীস (রহ.) ওই হাদিয়া গ্রহণ করলেন এবং নিজের মাথায় রেখে বললেন, এটা আমার জন্য বিশাল এক নেয়ামত। আসলে

আপনার সঙ্গে বসে খেতে খুব মন চাচ্ছিলো। কিন্তু কী করবো, হাতে সময় কম। এখন তো দেখি, রাস্তা সহজ করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে একেই বলে দ্বীন। এটাই তো ইসলামের শিষ্টাচার।

মহব্বত মানে মাহবুবকে শান্তি দেয়া

অথচ প্রথার জালে আজ আমরা এমনভাবে ফেঁসে গেছি যে, আমরা ইসলামের শিষ্টাচার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) চমৎকার বলেছেন, অন্তরে গেঁথে নিতে পারলে আমাদের কাজগুলোও 'চমৎকার' হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন–

"محبت نام ہے محبوب کو راحت پہنچانے کا"

অর্থাৎ– মহব্বত মানে মাহবুবকে আরাম ও সুখ দেয়া। যার সঙ্গে মহব্বত আছে, তার আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখ। নিজের ইচ্ছা পূরণ করার নাম মহব্বত নয়। মহব্বতকারী বোকা ও অথর্ব হলে তখন মাহবুবকে কষ্ট পেতে হয়। মূলত থানবী (রহ.)-এর উক্ত বাণী পবিত্র হাদীসেরই ভাব প্রকাশ। যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

خَالِقُوْا النَّاسَ بِاَخْلَاقِهِمْ

মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর তার রুচি ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। এসব কথা বুযুর্গদের সংস্পর্শ ছাড়া সচরাচর পাওয়া যায় না। এটাই আমার অভিজ্ঞতা। থানবী (রহ.) নিজের খানকায় বসে দ্বীনের এসব শিষ্টাচার মানুষকে শিখিয়েছেন, আলোচ্য হাদিসটি আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এসব শিষ্টাচার মানুষকে শিখিয়েছেন, আলোচ্য হাদিসটি আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে এটি একটি মূলনীতিও।

হযরত থানবী (রহ.)-এর সংস্পর্শপ্রাপ্ত কবি মরহুম জিগার মুরাদাবাদী এ সম্পর্কে একটি চমৎকার পঙক্তি বলেছেন। পঙক্তিটি আমাদের সামাজিক জীবনের মূল্যবান পাথেয়ও বটে। তাঁর ভাষায়–

اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں

اپنا تو زیاں منظور سہی اوروں کا زیاں منظور نہیں

লাভালাভঘেরা এ দুনিয়াতে সব কাজ নিজের মর্জিমতো হয় না। হোক না নিজের কষ্ট, তবুও যেন অন্য কেউ কষ্ট না পায়। নিজের কষ্ট মেনে নেয়া যায়, কিন্তু অপরের কষ্ট কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটাই ইসলামের শিক্ষা, এটাই ইসলামের শিষ্টাচারপর্বের সারকথা।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -